কৈলাস
মানস সরোবর যাত্রা

শ্যামাপদ দাস

প্রভা প্রকাশনী

পরিবেশক : প্রোগ্রেসিভ বুক ফোরাম
৩৩, কলেজ রো, কলি-৯

প্রকাশক :
শ্রীঅসীমকুমার মণ্ডল
প্রভা প্রকাশনী
মাঠপাড়া, সোনাচন্দনপুকুর
বারাকপুর, উঃ ২৪ পরগণা

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ১৩৬৭

মুদ্রণ :
অজিত দাস-ঘোষ
বাসন্তী প্রেস
৩৭, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬

লেখকের নিবেদন

বিগত ১৩০৫ অব্দের কথা। স্বামীরামানন্দ ভারতী ঐ বছর কৈলাস-মানস সরোবর দর্শনে যাওয়ার পথে যোশীমঠের কিছু দূরে মলহারী গ্রামে এক রাত্রি বিশ্রাম করেছিলেন। বিশ্রাম কালে উক্ত গ্রামের এক বৃদ্ধকে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"কোন্ পথে গেলে মানস সরোবরে শীঘ্র শীঘ্র পঁহুছিতে পারিব, সেই বিষয়ে তোমার কাছে জানতে ইচ্ছা করি।"

বৃদ্ধ উত্তর করেছিলেন—"স্বামিজী, এখন মানস সরোবরে যাওয়া বড় কঠিন ও প্রাণ পণ না করিলে তথায় যাওয়া যায় না···।"

সেটি ছিল ইংরাজী ১৮৯৮ সাল। তারপর বহু বছর পার হয়ে গেছে কিন্তু মানস সরোবরে যাওয়ার ব্যাপারে সেই বৃদ্ধের কথাটি আজও সমান ভাবে প্রযোজ্য। আজও প্রাণপণ না করলে সেখানে যাওয়া যায় না। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে পাশ পোর্ট, প্রচুর অর্থব্যয়, ডাক্তারী পরীক্ষার ভয় ও ভাগ্য।

দুর্গম হিমালয় পার হয়ে তিব্বত দেশ। সেখানে কৈলাস পর্ব্বত। দেবাদিদেব মহাদেবের আবাসস্থল। কৈলাসের নীচে ব্রহ্মা সৃষ্ট মানস সরোবর। দুটি-ই হিন্দুদের সর্ব শ্রেষ্ঠ তীর্থ। দুর্গমতম তীর্থও বলা চলে।

প্রশ্ন উঠতে পারে হিমালয়ের এত তীর্থ থাকতে আমার মত এক-জন গেঁয়ো মানুষের হঠাৎ কৈলাস-মানস সরোবরে যাওয়ার ঝোঁক চাপল কেন? এর পিছনেও ছোট্ট ইতিহাস আছে। বছর তিরিশ আগের কথা। তখন হুগলী জেলার চুঁচুড়ায় থাকি। তৃতীয় কিম্বা চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি। একদিন রাস্তায় একটি ভারতের মানচিত্র কুড়িয়ে পাই। মানচিত্রের উপরের দিকে এক জায়গায় লেখা ছিল 'মানস' সরোবর। তখন সরোবর কথাটির অর্থ বুঝতে শিখেছি। কিন্তু মানচিত্রে আর কোথাও [redacted] দেখে ভাবি নিশ্চয় খুব বড় সরোবর হবে। আর ঐ তখনই মানস সরোবর কথাটির সাথে

আমার প্রথম পরিচয়। তারপর পড়াশুনা শেষ করে কর্ম জীবনে জড়িয়ে পড়েছি এবং চুঁচুড়া ছেড়ে বাঁকুড়ার এক গ্রামে বসবাস শুরু করেছি।

বছর দশেক আগে স্থানীয় পাঠাগার থেকে একটি বই পাই। বইটির নাম—হিমালয় পারে কৈলাস ও মানস সরোবর। লেখক—শ্রদ্ধেয় প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়। বইটি হাতে নিয়ে শৈশবের মানচিত্রটির কথা মনে পড়ে যায় এবং অতি আগ্রহের সাথে বইটি পড়ে শেষ করি। উক্ত বই যারা পড়েছেন তারা জানেন, বইটি শুধু অতি উচ্চ শ্রেণীর ভ্রমণ কাহিনী-ই নয়; লেখকের স্বহস্তে অঙ্কিত বহু সুদৃশ্য ছবি দ্বারা অলংকৃত। এই বই পড়ে ও ছবি দেখে মনে তিব্বত ও কৈলাস-মানস সরোবর সম্পর্কে একটা ধারণা জন্মায় ও কৈলাস-মানসের প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভূত হতে শুরু করে। কিন্তু তখন কৈলাসে যাওয়ার কথা ভাবতে পারি নি। কারণ চীন-ভারত যুদ্ধের পর ঐ পথ বন্ধ ছিল।

এর পরের ঘটনা ১৯৮১ সালের। সংবাদ পত্রের মাধ্যমে জানতে পারি ভারতীয় তীর্থ যাত্রীদের জন্য কৈলাস-মানসের পথ খুলে গেছে। ঐ বছর সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম ভারতীয় তীর্থ যাত্রীদল কৈলাস দর্শন করে ফিরে আসেন। দিল্লী থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় তাদের কয়েক জনের যাত্রা বিবরণী পড়ি এবং মনের মধ্যে কৈলাস যাওয়ার বাসনা দানা বাঁধতে শুরু করে। ১৯৮২ সালের মে মাসে কৈলাস যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে দিল্লীর বিদেশ মন্ত্রকে একটি চিঠি পাঠাই। উত্তরে বিদেশ মন্ত্রক একটি আবেদন করার নিয়মাবলি পাঠান। তাতে দেখা যায়, বছরের জুন থেকে সেপ্টেম্বর চার মাস যাত্রীদের পাঠানো হয়। আবেদন করার জন্য প্রথমেই যে জিনিসটির প্রয়োজন সেটি হচ্ছে একটি বৈধ পাশপোর্ট। এরপর পাশপোর্ট তৈরীর কাজে নেমে পড়ি এবং পেয়েও যাই। ১৯৮৩ সালের মে মাসে আবেদন করে জুলাই মাসে তৃতীয় ব্যাচে যাওয়ার জন্য নির্বাচিত হই। স্বীকার করতে লজ্জা নেই ঐ সময় তিব্বতে যাওয়ার জন্য যে সব গরম পোশাক

ও আনুসঙ্গিক উপকরণের প্রয়োজন ছিল, তা কিছুই আমার ছিল না। অনেকে দেবার আশ্বাস দিয়েছিলেন কিন্তু যাত্রার দিন এগিয়ে আসার সঙ্গে তারাও অদৃশ্য হলেন। ভাবনা চিন্তায় শরীরও খারাপ হ'য়ে পড়লো। এইভাবে সে বছর যাওয়া হয়ে উঠলো না। এরপর প্রতি বছরই আবেদন করতে থাকি। ৮৭ সালে জুন মাসে পুনরায় যাওয়ার সুযোগ আসে। ৯ই জুন দিল্লীতে রিপোর্ট করি। কিন্তু সামান্য একটু অসুবিধার জন্য যাত্রায় বাধা পড়ে। বাড়ি ফিরে অসুবিধাটুকু দূর করে আগস্ট মাসে আবার দিল্লী যাই এবং শেষ ব্যাচে নিরাপদে কৈলাস যাত্রা করে ফিরে আসি।

সুধী পাঠককে জানিয়ে রাখি লেখার ব্যাপারে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই। লেখার মধ্যে ভাষার অসঙ্গতি ও ভুল ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। পাঠক নিজগুণে ওগুলি ক্ষমা করবেন। হাল আমলে কৈলাস যাত্রা আরম্ভ হওয়ার পর, বর্তমানের যাত্রাপথ, আনুসঙ্গিক খুঁটিনাটি ও কৈলাস পরিক্রমা পথের পরিষ্কার ধারণা করা যায়, এমন লেখার খুবই অভাব বোধ করছি। সেই কারণেই ব্যক্তিগত জীবনে যন্ত্রবিদ হয়েও কলম ধরতে হয়েছে। আশা করি ক্ষমাশীল পাঠক আমার এই ধৃষ্টতা টুকু ক্ষমা করবেন।

বইটি প্রকাশ করার ব্যাপারে যিনি আমাকে সহযোগিতা করেছেন সোনামুখী টাউন লাইব্রেরী-র গ্রন্থাগারিক শ্রদ্ধেয় স্বপনকুমার ঘোষ। আমাকে যেভাবে উপকৃত করেছেন তার জন্য তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। প্রকাশক অসীম কুমার মণ্ডল এবং প্রেস কর্মীদের অশেষ ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে কৈলাস-যাত্রার ব্যাপারে যারা আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, এই সুযোগে তাদের সকলকে অন্তরের শ্রদ্ধা ও মনের কৃতজ্ঞতা জানাই। কৈলাস-মানস সরোবর সম্পর্কে যারা আগ্রহী তাদের যদি বইটি ভাল লাগে এবং ভবিষ্যতে কৈলাস যাত্রীদের মধ্যে একজনও যদি বইটি পড়ে উপকৃত হন তবেই আমার এ প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। নমস্কার।

পোঃ সোনামুখী, বাবুপাড়া
বাঁকুড়া

শ্যামাপদ দাস

উদ্যোগ পর্ব

২৩শে আগষ্ট ১৯৮৭ সাল রবিবার। ভোর ৫ টায় টিপ টিপ বৃষ্টি মাথায় নিয়ে বাড়ী থেকে বের হলাম। উদ্দেশ্য বর্ধমান হয়ে দিল্লী এবং সেখান থেকে তিব্বতের কৈলাস-মানস সরোবর যাওয়ার বাসনা। পিঠে কেবলমাত্র একটি ফোল্ডিং ব্যাগ। সেই ব্যাগ নিয়ে কুটুম বাড়ী যাওয়া যেতে পারে কিন্তু তিব্বত যাচ্ছি বললে কোন লোকই বিশ্বাস করত না। সেদিন ছিল বড় রাজনৈতিক নেতার কলকাতায় মিটিং। হাজার হাজার লোক চলেছে কলকাতায় অপর দিকে আমার গ্রাম থেকে সকালে বর্ধমান যাবার একটিমাত্র বাস। কাজেই ভিড় সহজেই অনুমান যোগ্য। যাইহোক্ বর্ধমান জংশন থেকে সকাল ১১টায় ১০৩নং আপ এয়ার কাণ্ডিশন এক্সপ্রেসে উঠে বসলাম। বিনা রিজার্ভেশনে দিল্লী পর্যন্ত ভাড়া লাগল ১০৪ টাকা। একটি থ্রিটায়ার কামরায় উঠে একটু বসার জায়গা পাওয়া গেল। বসেই চিন্তা হল রাত্রের জন্য। কারণ বিনা রিজার্ভেশনের যাত্রীদের রাত্রে কি দুর্গতি হয় তা পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে ভালই জানা ছিল। আমার সঙ্গেই বর্ধমান স্টেশন থেকে ২৪।২৫ বছরের দুটি যুবক একই কামরায় উঠল। দুজনেই দিল্লী বেড়াতে চলেছে এবং তাদের রিজার্ভেশন করা আছে। যুবক দুটির সঙ্গে আলাপ করার পর বল্লাম "আপনাদের তো রিজার্ভেশন আছে, টি. টি. ই-কে বলবেন যে আমি আপনাদের লোক তাহলে রাত্রে আমাকে নামিয়ে দেবে না।" যুবক দুটি আমার কথায় রাজী হবার পর একটা দুশ্চিন্তা কমলো।

আসানসোল পার হবার পর নিজের রসদ সম্বন্ধে একটু চিন্তা করে নিলাম। ব্যাগের মধ্যে একটি গান্ধী আশ্রমের কোট, দুজোড়া শার্ট-

প্যান্ট, একটি হাতে বোনা ফুলহাতা সোয়েটার, একটি পুরো হাতা গেঞ্জি, একটি লেডিস শাল ও একটি বিছানার চাদর। এ ছাড়া একটি টর্চ, একটি কমদামী ক্যামেরা, সামান্য ওষুধ, হাজার খানেক নগদ টাকা ও কিছু ট্রাভেলার্স চেক ব্যাস্ এটাই পুঁজি। মনে আশংকা হয় এই নিয়ে কৈলাস যেতে পারব তো? পরক্ষণেই মন থেকে কার যেন উৎসাহ পাই, বেরিয়ে যখন পড়েছি নিশ্চয়ই পারব—যে নিয়ে যাবার সেই নিয়ে যাবে।

সন্ধ্যার একটু আগে একটি বড় স্টেশনে গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে এমন সময় দু'জন রাইফেলধারী রেল পুলিশ এসে হাজির। কি ব্যাপার! হয় রিজার্ভেশন দেখাও নয় গাড়ী থেকে নেমে যাও। কি মুস্কিল! ছুটলাম টি. টি. ই-এর কাছে। ভদ্রলোক বাঙালী, বুঝিয়ে বললাম—"তিন জন আছি, দুটি রিজার্ভেশন আছে। আপনি অনুমতি করলে একসঙ্গে যেতে পারি।" ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে অনুমতি দিলেন, রাত্রি নির্বিবাদে কাটলো।

পরের দিন সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ গাড়ী নিউ দিল্লী স্টেশনে পৌঁছানোর কথা। কিন্তু পৌঁছলো প্রায় বেলা তিনটায়। মাঝপথে একটি মালগাড়ী লাইন চ্যুত হবার কারণেই এতটা দেরী।

স্টেশনের বাইরে একটি অটো ধরেছি কালীবাড়ী যাব বলে, এক বাঙালী যুবক এসে বলল "দাদা, আমিও কালীবাড়ী যাব, আমাকেও নিয়ে চলুন।" তাকেও উঠিয়ে নিলাম। দিল্লী স্টেশনে অটো ধরা কম কষ্টকর নয়। জানলাম যুবকটি আসছে কলকাতা থেকে। দিল্লীতে ইন্টারভিউ আছে।

যাইহোক কিছু পরে কালীবাড়ী পৌঁছালাম। পূর্বেই সিট রিজার্ভ করা ছিল। তাই কোন অসুবিধা হল না।

দিল্লীর বাঙালী কালীবাড়ী। নতুন দিল্লীর মন্দির মার্গে অবস্থিত। দিল্লী ভ্রমণকারী বাঙালীদের থাকা-খাওয়ার আদর্শ স্থান। এখানে কালী ও মহাদেবের মন্দির আছে। অন্যদিকে তিনতলা ধর্মশালা। ঘরে আলো, পাখা আছে, একটি খাটও দেয়।

একা থাকলে ডর্মেটরি, সঙ্গে মহিলা থাকলে ঘর দেয়। সকালে চা-বিস্কুট, দুপুরে ভাত-ডাল, দুটি তরকারী, মাছের ঝোল, বিকালে চা, রাত্রে ভাত-ডাল, দুটো তরকারী, মাছের ঝোল। থাকা-খাওয়া দৈনিক কুড়ি টাকা। তবে তিন দিনের বেশী থাকা যায় না। আমি কালীবাড়ীতে দোতলায় ডর্মেটরিতে স্থান পেলাম। গত জুন মাসে এসে যে সিটটিতে ছিলাম তার উল্টো দিকের সিটটি এবারে বরাদ্দ হল। মুখে চোখে জল দিয়ে সুস্থির হয়ে বসতেই দেখি—এক ভদ্রলোক একটা সিটে বসে ঘরের অন্যান্য বাসিন্দাদের বক্তৃতার ভঙ্গিমায় কিছু বলছেন। কথায় কিছুটা পূর্ববঙ্গীয় টান। কথার মধ্যে দু-একটা খাঁটি বাঙালী বিশেষণ কানে এলো। মুখ হাত মুছে ভদ্রলোকের সামনে গিয়ে বসে বললাম "দাদা, নমস্কার, আপনার পরিচয় ?" ভদ্রলোকের গোলগাল চেহারা, মাঝারী গঠন, রং কালো খালি গা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে তিলক, বয়স গোটা পঁয়তাল্লিশ হবে। পাশ থেকে এক ছোকরা জবাব দিল "দাদা যে সে লোক নন, কৈলাসে চলেছেন।" বুঝলাম ইনিও একজন কৈলাস যাত্রী। দাদা উত্তর দিলেন "বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মূর্খ যারা, তারাই কৈলাসে যায়। আমি একজন মূর্খ তাই কৈলাসে চলেছি। তা আপনি কি উদ্দেশ্যে ?"

বললাম "আমিও আগামীকাল আপনার সঙ্গে সাউথ ব্লকে রিপোর্ট করতে যাব। (কৈলাস যাত্রীদের প্রথমে দিল্লীর সাউথ ব্লকে রিপোর্ট করতে হয়।)

দাদা চেঁচিয়ে ওঠেন "আপনিও কৈলাস যাত্রী নাকি ? যাক্ আপনাকে দেখে তবু মনে একটু বল পাচ্ছি। এর আগে এক দিদি কালীবাড়ীতে এসেছেন, কৈলাসে যাবেন বলে। তাকে দেখে অব্দি আমি ভীষণ নার্ভাস হয়ে আছি।"

জিজ্ঞেস করলাম "দিদি কোথায় ?"

"একটু পরেই দেখা হবে।" দাদা জবাব দিলেন।

তারপর আমি নিজের পরিচয় দিয়ে বললাম যে, ফার্ষ্ট ব্যাচে

নির্বাচিত হয়ে দিল্লী এসে ছিলাম কিন্তু সামান্য কারণে আটকে যাই, এখন সেটি সংশোধন করে লাষ্ট ব্যাচে এসেছি, যাবার নিশ্চয়তা কিছু নেই—একটা চান্স নিচ্ছি মাত্র। যদিও ভাগ্যে থাকে তবে যাব।

সব শুনে দাদা বললেন, "আপনি একবার ঘুরে গেছেন, পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে; আপনি সঙ্গে থেকে আমার ভালই হল।" এই ভদ্রলোকই ভট্চাযদা। সমগ্র কৈলাস যাত্রায় যিনি যাত্রীদের হাসি আনন্দে মাতিয়ে রেখেছিলেন। এর কিছু পরে আমি ও ভট্চাযদা দুজনে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছি, এমন সময় সেই দিদির সঙ্গে দেখা। ভট্চাযদা আমার পরিচয় দিয়ে বললেন—"ইনিও কৈলাস যাত্রী।" দিদিকে নমস্কার জানালাম। লম্বায় সাড়ে চার ফুট হবেন। অত্যন্ত শীর্ণকায়া। রং মাঝারী! সম্ভবতঃ অবিবাহিতা। বয়স আন্দাজ করা সম্ভব নয়। তিনজনে নীচে কালীবাড়ীর গেটের কাছে দাঁড়ালাম। সামনে মন্দির মার্গ রাস্তা। বহুলোক কালীবাড়ী আসছে যাচ্ছে। এমন সময় দেখি এক লম্বা বলিষ্ঠ যুবক কালী-বাড়ীর সিঁড়ির দিকে যাচ্ছেন। যুবকের হাতে মস্ত এক ভি, আই, পি, সুটকেস, পিঠে ঢাউস রুক স্যাক, অপর হাতে বড় এক ব্যাগ। তাকে দেখিয়ে ভট্চাযদা বলেন "দেখুন, আমার মনে হয় উনিও কৈলাস যাত্রী—কারণ একা মানুষ এত মাল! চলুন উপরে গিয়ে দেখি।" দিদি নীচেই রইলেন! দুজনে উপরে গিয়ে দেখি—সত্যিই, ভদ্রলোক কৈলাস যাত্রীই বটেন। পরিচয় করে জানতে পারি —বাড়ী বেহালায়। প্রাক্তন নামকরা ফুটবল খেলোয়াড়। ভদ্রলোকের স্বাস্থ্য খুবই ভাল, লম্বা চেহারা, শ্যামলা রং, চোখে চশমা। এখন থেকে আমরা ওঁকে ঢালিদা বলেই ডাকব।

ভট্চাযদা ও ঢালিদা যথা সম্ভব প্রচুর মালপত্র এনেছেন। ডলিদি কি এনেছেন জানি না। কেবল ভাবছি নিজের কথা। কোন খাবার-দাবারও নেই, বিছানার মধ্যে কেবল একটি বিছানার চাদর। আমি কি বেডিং এনেছি ভট্চাযদা এই কথা জিজ্ঞাসা করায় বলি—এনেছি শুধু একটি বিছানার চাদর। শুনে অবাক হলেন ওঁরা।

অথচ ওঁরা দুজনেই কলকাতা থেকে ভাল শ্লিপিং ব্যাগ এনেছেন। খাবার-দাবারের তো কথাই নেই। চোদ্দদিন কেন, একমাস খেলেও ফুরাবে না।

গত জুন মাসে আমি একবার এসে ফিরে গেছি ঠিকই কিন্তু কৈলাস যাত্রার ব্যাপারে ভারত সরকার কি ব্যবস্থা করেছেন সেটা ভাল করে জেনে গিয়েছিলাম। এও জেনেছিলাম যে রাস্তায় কোনরূপ বেডিং অথবা খাবার (টুকিটাকি বাদে) নিয়ে যাবার দরকার নেই। ভারতীয় সীমানায় খাবার সরকার দেয় এবং তিব্বতে যা খাবার লাগে তার মধ্যে চীন সরকার পাঁচ দিনের খাবার দেয়। বাকী যা খাবার লাগে তাও দিল্লীর একটি আশ্রম থেকে বিনামূল্যে দেওয়া হয়। এমন কি বাসন-পত্র পর্যন্ত। কৈলাস যাত্রায় শ্লিপিং ব্যাগের অবশ্যই প্রয়োজন আছে কিন্তু কলকাতা থেকে বয়ে নিয়ে না গেলেও চলে। কারণ ধারচুলায় ৫০ টাকার বিনিময়ে ভাল শ্লিপিং ব্যাগ ভাড়া পাওয়া যায়। বিদেশী শ্লিপিং ব্যাগ কেনাও যায়। দাম ২৯০ টাকা, কলকাতায় যার দাম ছয়শ-সাতশ টাকা। সেই ভাবেই দ্বিতীয় বারে এসেছিলাম। দাদারা নিজের মালপত্র নিয়েই অস্থির অথচ আমি বেশ ঝাড়া হাত পা।

পরের দিন বেলা ৯টায় সাউথ ব্লকের বিদেশ মন্ত্রীকে রিপোর্ট করার কথা। আটটা নাগাদ চারজনে কালীবাড়ী থেকে রওনা হলাম। নটার কিছু আগে ওখানে পেঁছালাম। গেটে জনা তিনেক দাঁড়িয়ে, সকলেই কৈলাস যাত্রী। গিয়ে হাত মিলিয়ে পরিচয় করলাম। সকলেই পুনে থেকে এসেছে। গেটের ভিতর ঢুকে সারি সারি রাইফেলধারী গার্ডদের অতিক্রম করে রিশেপসন কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়ালাম। কাউন্টারের ডানদিকে ও বাঁদিকে জনসাধারণের বসার জায়গা। রিশেপসানিষ্ট ভদ্রলোক সেখানে অপেক্ষা করতে বললেন। ডানদিকের হলটিতে সামনে ও বাঁদিকে সোফা পাতা, মাঝে একটি ছোট টি টেবিল। ঢুকেই নজরে পড়ল বাঁদিকে সোফার প্রথমেই এক বাবাজী বসে রয়েছেন। রং কালো, স্বাস্থ্য মাঝারী, পরনে সাদা ধুতি ও

চাদর। চুল দাড়ি ও ভ্রূ সবই সাদা। আমি গিয়ে বাবাজীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। উনি মাথায় হাত দিয়ে বললেন "নারায়ণ" কোথা থেকে আসছেন, এই কথা জিজ্ঞেস করতে উনি উত্তর করলেন "ম্যায় বদ্রীনাথ মন্দির মে রহতা হুঁ"। বদ্রীনাথের কথা শুনে আমার মনে একটু ভক্তির ভাব এল। বাবাজীকে বললাম "ম্যায় পশ্চিমবাংলা মে আয়া হুঁ" পহেলা ব্যাচ্ মে আয়া থা, লেকিন বাপস যানী পড়া। অব ম্যায় লাষ্ট ব্যাচসে আয়া হুঁ, আপ মুঝে আশীর্বাদ কিজিয়ে তাকি ম্যঁায় কৈলাস দর্শন কর সকুঁ। বাবাজী মাথায় হাত দিয়ে বললেন "নারায়ণ"। পরে এই বাবাজীই আমাদের সঙ্গে কৈলাস গিয়েছিলেন। নাম শ্রীরাম বাবা। তখনও লক্ষ্য করেছি কথা উনি খুবই কম বলতেন। "নারায়ণ" এই শব্দটির মধ্যে দিয়েই অধিকাংশ ক্ষেত্রে মনের ভাব প্রকাশ করতেন।

যাইহোক্ তারপর একে একে যাত্রীরা আসতে লাগলেন। সবাই এলে আমি গুনে দেখলাম প্রায় ৩৫।৩৬ জন হবেন। ইতিমধ্যে দিল্লীর এক স্বামিজী এসে পেঁাচেছেন, তিনিও যাত্রী এবং দলের সরকারী অফিসার মনিন্দার সিংহের সাথে পরিচয় হল। ভদ্রলোক পাঞ্জাবী। কিছু পরে বিদেশ মন্ত্রকের এক কর্মচারী নীচে নেমে এসে সকলের নাম ডাকতে লাগলেন। নাম ডাকার পর সকলের পাশপোর্ট নম্বর নেওয়া হ'ল এবং প্রত্যেককে বলা হল ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া হাসপাতালে জনৈক ডাক্তারের কাছে রিপোর্ট করতে, কারণ সেখানেই ডাক্তারী পরীক্ষা হবে। হাসপাতাল বিদেশ মন্ত্রক থেকে বেশ কিছুটা দূরে। আমি স্বামিজীর স্কুটারের পিছনে চেপে সেখানে পেঁাছালাম। হাসপাতালে পেঁাছে দুটি ফরম্ পূরণ করতে হল, একটি এক্সরে অন্যটি ই. সি. জি-র জন্যে। তারপর শুরু হল একস্‌রে—ই.সি.জির জন্য ছোটাছুটি। হাসপাতাল বেশ কয়েক একর নিয়ে এবং অনেক-গুলি ব্লক আছে। দোতলা থেকে একতলা, এক ব্লক থেকে অন্য ব্লকে ছোটাছুটি করে আমার অবস্থা কাহিল। ১০টায় শুরু হয়ে বিকেল ৪টায় একস্-রে-ই. সি. জি. সম্পন্ন হল। শুধু একদিনে মেডিকেল

শেষ নয় তার পরের দিনও আছে।

পরের দিন খাওয়া-দাওয়া করে ৯টার পরে বের হয়ে হাসপাতালে পৌঁছালাম। কিছু শারীরিক পরীক্ষা বাকী ছিল, সেগুলি শেষ হল—যেমন রক্তচাপ, ওজন, নাড়ীর গতি, লিভার ও অন্যান্য। কোন যাত্রীর হাইড্রসিল, হার্নিয়া থাকলে অযোগ্য বিবেচিত হবেন। এর পরে এক্সরে, ই. সি. জি-র রিপোর্ট হাতে লাইন দিলাম বিশেষজ্ঞের দরজায়। তিনি সব কিছু দেখে বুক পরীক্ষা করে নিজের মতামত লিখলেন—তখনও বুক দুরু দুরু করছে। পাশ করতে পারব তো? মনে একটা বিশ্বাস সর্বদাই আছে—যার কাছে যাচ্ছি সেই নিয়ে যাবে। এই কর্ম সারা হবার কিছুক্ষণ পর মেডিকেল বোর্ডের সামনে ডাক পড়ল। তাঁরা বিচার করে দেখবেন—আমি যেতে পারব কি না? এবং ফিটনেস সার্টিফিকেট দিলে তবেই যেতে পারবো। মেডিকেল প্রধান বাঙালী, তিনি আমার শীর্ণকায় শরীরটার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই শরীর নিয়ে যেতে পারবেন?" বললাম—"যাঁর কাছে যাচ্ছি, তিনি নিয়ে গেলে নিশ্চয়ই পারবো।" ভদ্রলোক হাসি মুখে ফিটনেস্ সার্টিফিকেট দিলেন।

ঘর থেকে যখন বেরিয়ে এলাম তখন শরীর খুবই হালকা। মেডিকেলে আটকে যাবার ভয় আর নেই। বাইরে পাতা বেঞ্চিতে বসে একটু বিশ্রাম করে নিলাম। দুদিন ধরে ছোটাছুটি টেনশন্, এখন একটু বিশ্রামের অবকাশ মিলল। কিছু পরে আনন্দিত মনে কালী-বাড়ী ফিরলাম। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, ডাক্তারী পরীক্ষায় এই বাড়াবাড়ি দেখে প্রত্যেক যাত্রীই মনে মনে খুবই বিরক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তী কালে লিপুলেক পাসে ওঠার সময় এবং কৈলাস পরিক্রমার সময়ে বুঝতে পেরেছিলাম যে এই রকম ডাক্তারী পরীক্ষার সত্যই দরকার আছে।

পরের দিন বিদেশ মন্ত্রকে ব্রিফিং, নটার আগেই হাজির হলাম। দেখা গেল বাদ সাদ দিয়ে ৩৮ জন যাত্রী যাত্রার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। সকলের মধ্যেই খুশীর ভাব। বিদেশ মন্ত্রকের কমিটি

রুমে বিশাল ডিম্বাকৃতি টেবিলের চারিধারে যাত্রীরা গোল হয়ে বসলেন। বিদেশ মন্ত্রকের 'আণ্ডার সেক্রেটারী' এক প্রান্তে বসে যাত্রীদের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ জ্ঞাপন করলেন এবং ভিসার ফরম্ পূরণ করালেন। এর পর পাশপোর্ট ও দুকপি ফটো জমা দিতে হল। ভিসা ফি ৭০ টাকা। এই সময় যাত্রীরা নিজের দায়িত্বে কৈলাস যাত্রায় যাচ্ছেন, এই ফর্মে ১০ টাকার স্ট্যাম্পের উপর লেখা একটি বণ্ড সরকারের কাছে জমা দিতে হয়। গত জুন মাসে এসে দিল্লীর পাতিয়ালা হাউসে গিয়ে আমি একটি বণ্ড করে রেখেছিলাম সেটি এখন জমা দিলাম। এর পরে স্বামিজী যাত্রায় খুঁটিনাটি সব কিছু নিয়ে যাত্রীদের সঙ্গে আঁলোচনা করলেন। তিন ঘণ্টা পরে এই সব কাজ শেষ হলো।

পরের দিন শুক্রবার বিকেলে ভিসা সমেত পাশপোর্টগুলি ফেরৎ দেওয়া হল এবং বলে দেওয়া হল ৩১শে আগষ্ট সোমবার সকালে বৈদেশিক মুদ্রা নেবার জন্য পার্লামেন্ট ষ্ট্রীটের ষ্টেট ব্যাঙ্কের শাখায় যেতে এবং ১লা সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার ভোর ৪টায় যাত্রা শুরু হবে।

পরদিন শনিবার সামান্য কেনাকাটা করে নিলাম কারণ বাড়ী থেকে প্রায় কিছুই আনা হয়নি এবং রবিবার সম্পূর্ণ বিশ্রাম। দিল্লীতে নেমে থেকেই ছোটাছুটি ও উৎকণ্ঠা। এখন ততটা নেই তবে কৈলাস যাওয়ার উৎসাহ ঠিকই আছে।

সোমবার সকালে বিদেশ মন্ত্রক হয়ে ষ্টেট ব্যাঙ্ক। এখানে জানিয়ে রাখি প্রত্যেক কৈলাস যাত্রীকে ৪৮০ মার্কিন ডলার নিতে হয়। এর মধ্যে তিব্বতে ১৪ দিন থাকা, পাঁচদিন খাওয়া ও পরিবহন ব্যয় বাবদ ৩৮০ ডলার চীনা কতৃপক্ষকে দিতে হয়। ১০০ ডলার যাত্রী খুশীমত খরচ করতে পারেন অথবা ফেরৎ আনতে পারেন। ডলার নিতে দুপুর গড়িয়ে গেল। ইতিমধ্যে ঝির ঝির বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। আমি, ভট্‌চাযদা ও ঢালিদা বৃষ্টির মধ্যেই জনপথে চন্দ্রলোক বিল্ডিংয়ে কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগম-এর অফিসে হাজির হলাম। তিন তলায় একটি ছোট ঘর নিয়ে অফিস পাশে ষ্টেট ব্যাঙ্কের শাখা। কুমায়ুন নিগম-

এর অফিসে তিন হাজার টাকার ট্রাভেলার্স চেক জমা দিলাম। এই কুমায়ুন নিগম কৈলাস যাত্রীদের দিল্লী থেকে ভারত চীন সীমান্ত লিপুলেক পাস পর্যন্ত নিয়ে যায়। যাত্রীদের থাকা খাওয়া ও সকল পরিবহন ব্যয় বাবদ তিন হাজার টাকা প্রত্যেক যাত্রীকে দিতে হয়। কৈলাসের পথে তাওয়াঘাট পর্যন্ত বাস যেতে পারে, তারপর পায়ে হাঁটা পথ ; সেকথা এখন থাক, যথাস্থানে উল্লেখ করা হবে।

পরের দিন ভোর চারটায় যাত্রা শুরু। কালী বাড়ীতে আছি, গেট পাঁচটায় খোলে কাজেই রাত্রে কালী বাড়ীতে থাকলে ভোর চারটায় চন্দ্রলোক বিল্ডিং-এর সামনে বাস ধরা অসম্ভব। তাই ঠিক করলাম রাত্রে চলে এসে বাসেই সারারাত কাটাবো। নিগমের ভারপ্রাপ্ত অফিসারের সঙ্গে দেখা করে রাত্রে বাসে থাকার কথা বলায় উনি রাজী হলেন এবং একটি বাসের নম্বর দিয়ে বললেন বাস বিল্ডিংএর সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। ভট্চাযদা ও ঢালিদা আমার সঙ্গে একমত, তারাও রাত্রে বাসে থাকবেন। অগত্যা ডলিদিকেও রাজী হতে হল।

কালীবাড়ীতে দুপুরটা কাটিয়ে বিকেলে দুটো অটো ভাড়া করে চন্দ্রলোক বিল্ডিংয়ে মালপত্র জমা দিতে গেলাম। বিল্ডিং-এর পিছনে একটি রাস্তা আছে, সেখানে মিনিবাসের মত বাসটি দাঁড়িয়ে ছিল। সামনে ইংরাজী ও হিন্দীতে লেখা "দিল্লী থেকে কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রা।" আকাশী রংএর বোর্ডে সাদা লেখাগুলি কেমন যেন একটা আকর্ষণ জাগায়। বাসের গায়ে লেখা বাসের নাম "পর্বত ট্যুর"। বাসটি দেখে খুবই ভাল লাগল। সামনে বাসের ড্রাইভার কমল দাঁড়িয়ে ছিল। লোকটি খুবই ভাল, সুন্দর ব্যবহার। মালপত্র ঘাড়ে করে বাসের মাথায় তুলে দিলাম। ভট্চাযদা বাসেই রয়ে গেলেন। বাকী তিন জন সন্ধ্যার সময় কালীবাড়ী ফিরে এলাম।

আটটা না বাজলে কালীবাড়ীতে খাবার পাওয়া যায় না। তাই রাত্রি ৮টা বাজতেই খেয়ে নিলাম। মনে প্রচণ্ড আনন্দ ও উৎসাহ, কখন সকাল হবে, কখন যাত্রা করব কৈলাস-মানস সরোবর। রাত সাড়ে নটার পর অনেক চেষ্টায় একটা অটো ধরে চন্দ্রলোক বিল্ডিং-এ

হাজির হলাম। আমার সঙ্গীদের দিল্লী সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতাই নেই। তারা চেয়েছিলেন রাত এগারটা নাগাদ কালীবাড়ী থেকে বেরুতে কিন্তু আমি জানতাম এগারটায় কালীবাড়ীতে অটো পাওয়া অসম্ভব। তার উপর ঐ সময় দিল্লীতে উগ্রপন্থী হামলা ভালই চলছিল। এর পর বাসের খোঁজে বিল্ডিংএর পিছনে গেলাম। বাইরে থেকে ডাকতেই ভিতর থেকে ভট্চাযদার গলা পেলাম—"ভেতরে চলে এসো।" ভেতরে ঢুকে দেখি বাসের মধ্যে দু-একটা আলো জ্বলছে এবং মাথার উপর পাখাগুলি ঘুরছে। সীটগুলির এমন ব্যবস্থা যে সীটের সঙ্গে লাগানো একটা হ্যান্ডেল টানলেই সীট পিছনে হেলে পড়ে এবং প্রায় শুয়ে যাওয়া যায়। বাসের মধ্যে আরও দুজন যাত্রীকে দেখতে পেলাম, একজন কলকাতার অর্চনাদি অন্যজন পাটনার পাণ্ডে সাহেব। দু-জনেরই ভোর চারটার সময় আসার অসুবিধা থাকায় আগে ভাগেই চলে এসেছেন। এর কিছু পরে বাস থেকে নেমে একটু দূরে গিয়ে সামান্যক্ষণ পরেই ফিরে এসে দেখি বাসটি আর সেখানে নেই। এদিক ওদিক তাকিয়ে কোথাও বাসটি দেখা গেল না। মহা ফ্যাসাদ! কি আর করি বিল্ডিং-এর ভিতর দিয়ে জনপথে এসে দাঁড়ালাম। একটি লোক বসেছিল বোধহয় চৌকিদার হবে। তাকে হিন্দীতে বাসটি কোথায় গেল এই কথা জিজ্ঞেস করাতে বলল যে বিল্ডিংয়ের পাশে রাস্তায় দেখুন। গিয়ে দেখি সত্যিই বাসটি সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পাশে তিনটি অ্যাম্বসাডার গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। ৩৮ জন যাত্রীর বাসে জায়গা হওয়া সম্ভব নয় তাই তিনটি ট্যাক্সি করতে হয়েছে।

বাসে উঠে চিন্তা করলাম একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যায় কি না? বাসের সামনেও মেঝেতে প্রচুর মালপত্র, যেমন ইউরিয়ার খালি ব্যাগ, প্লাস্টিক সীট, এক বোঝা লাঠি, ঝুড়ি ভরতি খাবারদাবার ইত্যাদি। কাঁধের ঝোলা ব্যাগে তুলে সীটে শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলাম কিন্তু কেন জানিনা কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না। মনের ভিতর এমন একটা কিছু হচ্ছে যাতে ঘুম কিছুতেই সম্ভব নয়। সকলেরই একই

অবস্থা। এমন সময় অর্চনাদি আমায় ডেকে বলেন "ভাই, তোমার জন্যে পরটা ও তরকারী করে এনেছি, এক সময় খেয়ে নিও, অনেক যত্ন করে তৈরী করেছি।"

শান্তিতে শুয়ে থাকারও উপায় নেই কারণ ভট্চাযদা এমন এক একটি কথা বলছেন যে হেসে সবার পেটে খিল ধরে যাবার উপক্রম। ওনার কথার ধরনই ঐরকম। কিছু পরে বাসের এক কর্মী এসে ফ্যান গুলি বন্ধ করে নেমে চলে গেল। একে ভীষণ গরম তার উপর প্রচণ্ড মশার কামড়—ছট্ফট্ করতে করতে নিচে নেমে দাঁড়ালাম। ভট্চাযদা ও ঢালিদা ফুটপাতে প্লাষ্টিক সীট পেতে শুয়ে পড়লেন। আমি কিছুক্ষণ ফুটপাতে বসে থাকার পর বাসের ছাদে গিয়ে উঠলাম। ছাদে গরম কম তবে মশার কামড় দ্বিগুণ কাজেই ঘুম অসম্ভব। ছাদে একটি লোক শুয়েছিল, নাম জিজ্ঞেস করায় বলল: কুলুরাম। শুনলাম সে নাকি যেসব ঘোড়ার পিঠে যাত্রীদের মালপত্র নিয়ে যাওয়া হয় তার ঠিকাদার। কিছু পরে ছাদ থেকে নেমে সামনের ফাঁকা রাস্তা ও ফুটপাতে পায়চারি করে রাতটি কাটিয়ে দিলাম।

রাত সাড়ে তিনটে বাজতেই দু-একজন করে যাত্রীরা আসতে লাগলেন। আধ ঘণ্টার মধ্যে জায়গাটি চকচকে মানুষের-ঝকঝকে গাড়ীর ভিড়ে গমগম করতে লাগল। স্ত্রী-স্বামীকে, বাবা-মা ছেলেকে, বোন এসেছে ভাইকে বিদায় দিতে। আমি এক পাশে দাঁড়িয়ে দেখছি প্রিয়জনের জন্য মানুষের কি ব্যাকুলতা! অনেকেরই গলায় ফুলের মালা, হাতে ফুলের তোড়া। এই সব দেখে শুনে কেন জানিনা আমার দু-চোখ জলে ভরে উঠল। আমাকে একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সহযাত্রী বোম্বাইকে এক শেঠ্জী জিজ্ঞাসা করলেন "আপ যাত্রী হ্যায়?" বললাম "জী হ্যাঁ।" কথাটা ওনার বিশ্বাস হল কিনা জানিনা, উনি কোন কথা না বলে ট্যাক্সিতে মালপত্র গোছাতে লাগলেন।

পাঁচ মিনিট পরেই দলনেতা মণীন্দ্রর সিং এসে গেলেন এবং নাম ডেকে কিছু যাত্রীকে বাসে ও কিছু যাত্রীকে ট্যাক্সিতে যেতে বললেন। আমাকেও ট্যাক্সিতে যেতে বলায় সেখানে গিয়ে দেখি কোন জায়গা খালি

নেই। বাসে গেলাম সেখানেও কোন জায়গা খালি নেই। মণীন্দ্র সিংকে গিয়ে ধরলাম। তখন উনি বাসে উঠে একেবারে পিছনের সীটের মাঝখানে ঠেলেঠুলে একটু জায়গা করে বসিয়ে দিলেন। বসার ব্যাপারে প্রথমেই এই গোলোযোগ ঘটায় আমার মেজাজ খুবই বিগড়ে গেল কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে গেল একটি বইয়ে পড়েছিলাম—হিমালয়ের পথে কখনও অসন্তুষ্ট হতে নেই, যা পাওয়া যায় তাতেই খুশী থাকতে হয়। কথাটা স্মরণ হতেই নিজেকে সামলে নিলাম এবং বিরক্ত বোধটাও আস্তে আস্তে কেটে গেল।

: যাত্রা শুরু :

ভোর চারটা প°য়তাল্লিশ মিনিটে "ওঁ নম শিবায়" ধ্বনির মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু হল। সামনে ট্যাক্সি পিছনে বাস কিন্তু আমি আর চোখের পাতা খুলে রাখতে পারছি না। সারারাত জাগা এখন এই ভোরের বেলায় রাজ্যের ঘুম আমার চোখে নেমে এসেছে। বাস ছুটে চলেছে, তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থার আমি সীটে হেলান দিয়ে বসে আছি। তখনও বাইরে অন্ধকার কাটেনি।

দিল্লীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুবই আঁটোসাঁটো। শহর ছাড়িয়ে বাইরে বেরোবার মুখে এত চেকপোষ্ট আছে তা গুণে মনে রাখা সম্ভব নয়। চেকপোষ্টের কাছে গাড়ি থামলে গাড়ির ঝাঁকুনিতে তন্দ্রা ছুটে যাচেছ, সামনে পাশে পুলিশ ও পিচের ড্রাম ছাড়া আর কিছু দেখা যাচেছ না। অনেকক্ষণ পর দিনের আলো ফুটলো। আমার চোখে ঘুমের আমেজও আর ততটা নেই। ভাল ভাবে চোখ খুলে তাকিয়ে দেখি ফাঁকা রাস্তা দিয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে আর মাঝে মধ্যে এক একটি গ্রাম পার হয়ে যাচেছ। এইভাবে চলার পর সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ গাড়ি এক জায়গায় রাস্তা থেকে নেমে ডান দিকে একটু ফাঁকা জায়গায় দাঁড়াল। এতক্ষণ যে রাস্তায় গাড়ীটি আসছিল সেটি দিল্লী-মোরাদাবাদ রোড। গাড়ী থেকে সব যাত্রীরা নিচে

নামলাম। এই গ্রামটির নাম গজরৌলা। সামনে একটি চায়ের দোকান—নাম হাইওয়ে কাফে। চায়ের দোকান বলতে বাংলাদেশে আমরা যা বুঝি সেরকম নয়। মনে করুন—পথের ধারে গাছপালা দিয়ে সাজান একটি ছোট পার্ক, তার মধ্যে গাড়ী রাখার জায়গা আছে, পায়খানা বাথরুম আছে, সাজান গাছপালার পাশে সারি দিয়ে বেতের চেয়ার টেবিল পাতা। পাশে সাজান দোকানে চা-পকোড়া ইত্যাদি পাওয়া যায়। পরিবেশটি অত্যন্ত সুন্দর। মুখ ধোবার পর এক কাপ চা ও দু-পিস পাউরুটি খাবার পর একটু ঘোরাঘুরি করছি এমন সময় হাইওয়ে কাফের এক কর্মী এসে সামনে একটি খাতা মেলে ধরল। খাতায় বাংলায় লিখলাম, পরিবেশ খুবই ভাল। তারপর নাম সই করলাম। বাসের দিকে তাকিয়ে দেখি শ্রীরাম বাবা গাঁদা ফুলের মালা দিয়ে বাসের সামনেটি সুন্দর করে সাজাচ্ছেন, সত্যই দেখতে খুব ভাল লাগছে।

কিছুক্ষণ পরে গাড়ী ছেড়ে আবার আগের রাস্তা দিয়ে ছুটে চললো। রাস্তা চওড়া, গাছপালা তেমন নেই, মাঝে মাঝে ছোট গ্রাম। সাড়ে দশটা নাগাদ গাড়ী মোরাদাবাদ পেঁছাল। বাসের জানলা দিয়ে শহরটি দেখে অত্যন্ত ঘিঞ্জি ও অপরিচ্ছন্ন মনে হল। রাস্তার পাশে মোরাদাবাদ স্টেশন, মুসলমান অধ্যুষিত শহর মনে হল। শহর ছাড়িয়ে বড় ব্রীজের উপর এক নদী পার হয়ে গাড়ী ছুটে চললো। দিল্লী থেকে মোরাদাবাদ ১৬০ কিলোমিটার। মোরাদাবাদ থেকে ২৭ কিলোমিটার যাওয়ার পর রামপুর একটি ছোট শহর। রামপুর থেকে অনেকটা যাওয়ার পর বোধহয় নৈনিতাল জেলায় প্রবেশ করলাম। রাস্তার দু-পাশে গাছপালার প্রাচুর্য্য বাড়তে লাগল। এক জায়গায় দেখা গেল মাইলের পর মাইল সারি দিয়ে গাছ লাগিয়ে ইউক্যালিপটাসের জঙ্গল তৈরী করা হয়েছে। দেখলে মনে হয় সৈনিকরা প্যারেড করে যাচ্ছে। মনে পড়ে গেল বাংলাদেশের কথা —এই জঙ্গল একমাসের মধ্যে কেটে সাফ করে ফেলার ক্ষমতা বাঙালীর আছে। বারোটার কিছু পরে হলদোয়ানিতে ঢুকলাম। রাস্তাঘাটে

ভীষণ ভীড় তেমনি ধূলো, দোকানপাট যথেষ্ট। রামপুর থেকে হলদোয়ানি ৮৭ কিলোমিটার। হলদোয়ানি থেকে পাঁচ কিলোমিটার যাওয়ার পর এল কাঠগুদাম। এই কাঠগুদাম পর্যন্ত সমতল ভূমি। ছোট শহর, সবই পাওয়া যায়। শহর শেষ হবার মুখে রাস্তার বাঁদিকে কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগমের ট্যুরিষ্ট রেষ্ট হাউসের সামনে বাস থামল।

এই কাঠগুদাম সম্পর্কে পূর্বে বহুবার বইয়ে পড়েছি। বেরিলি থেকে কাঠগুদাম পর্যন্ত একটি ছোট রেল লাইন আছে। অতীতে কৈলাস যাত্রীরা বেরিলি থেকে ট্রেনে কাঠগুদাম এসে এখান থেকে পদব্রজে কৈলাসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতেন। দিল্লী থেকে বাসে গজরৌলা আসার পথে কুমায়ুন নিগমের পক্ষ থেকে প্রত্যেক যাত্রীকে একটি ছোট পুস্তিকা দেওয়া হয়েছিল—তাতে যাত্রার সমস্ত খুঁটিনাটি দেওয়া ছিল—কেমন করে কোথায় যাওয়া হবে, কোথায় রাত্রি বাস হবে, প্রত্যেক দিন যে রাস্তায় চলা হবে তার বিবরণী ইত্যাদি। পুস্তিকা অনুসারে কাঠগুদামে মধ্যাহ্ন ভোজন হবার কথা।

রাস্তা থেকেই রেষ্ট হাউসে দোতলায় উঠবার সিঁড়ি, সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডান দিকে ডাইনিং হল। লম্বা বড় টেবিলে ভাত, রুটি, ডাল, তরকারী, পায়েস, পাঁপড়, স্যালাড ইত্যাদি সাজান। পরিবেশন করার কেউ নেই, নিজে নিয়ে খেতে হয়। যে কেউ যত খুশী খেতে পারে। খাওয়ার পর রেষ্ট হাউসের থাকার ঘরগুলি ঘুরে দেখলাম। সাজানো গোছানো ঘর, ডানলোপিলোর বিছানা। নিচে নেমে এসে রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে জায়গাটা দেখতে লাগলাম। রেষ্ট হাউসের পর থেকেই পাহাড়ী উঁচুনিচু রাস্তা আরম্ভ হয়েছে।

এক ঘণ্টা পর আবার যাত্রা শুরু হল। বাসে আমার বাঁদিকে ব্যাঙ্গালোরের ডাঃ সুমিত্রা বসে আসছিলেন, এখন তাকে দেখতে পাওয়া গেল না। হয়ত ট্যাক্সিতে গেছেন। আমি জানালার ধারে গিয়ে বসলাম। কাঠগুদাম থেকে গাড়ী ছাড়তেই ঝিম্ ঝিম্ বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। জানালা দিয়ে বাহিরে তাকিয়ে দেখি—সামনে বৃষ্টি

ভেজা চক্‌চকে পীচের রাস্তা, রাস্তার বাদিকে পাহাড়, ডানদিকে খাদ। কাছের দূরের পাহাড় বিভিন্ন গাছপালায় সবুজ। বৃষ্টির জন্য দূরের পাহাড় আবছা। পাহাড়ের গা বেয়ে সাপের মত আঁকাবাঁকা রাস্তায় গাড়ী উঠে চলল। খানিক আগে যে রাস্তাটা আমরা ফেলে এসেছি—এখন উপর থেকে ডানদিকে অনেক নিচে সেই রাস্তাটিকে দেখতে পাই। বৃষ্টির মধ্যেও গাড়ী বেশ জোরেই ছুটে চলেছে। একবার যদি বৃষ্টি ভেজা রাস্তায় গাড়ীর চাকা পিছলায় তার যাত্রীদের কি গতি হবে কে জানে? কিছুক্ষণ প্রায় দম বন্ধ করেই বসে রইলাম। গাড়ীর ভিতরের কারও মুখে কোন কথা নেই। আমার ভয়ের একটু কারণ ছিল—এই যাত্রার পূর্বে আমি কখনও হিমালয় চোখেও দেখিনি, এরকম রাস্তায় বাসে যাতায়াত দূরের কথা।

প্রায় আধ ঘন্টা পরে বৃষ্টি থেমে গেল, চারিদিকে ঝক্‌ঝকে সূর্যের আলো। শুনেছি হিমালয়ের ব্যাপারই এই রকম—এই বৃষ্টি আছে, এই নেই। গাড়ী কখনও U-এর মত কখনও V-এর মত রাস্তায় একই ভাবে উঠে চলেছে। বাসের সহযাত্রীরা নিজেদের মধ্যে গল্প আলোচনায় মশগুল। আমার গল্প করার উপায় নেই কারণ আমার ডান দিকে যে দুজন মাদ্রাজী ভদ্রলোক বসেছিলেন তারা না জানেন হিন্দী না জানেন ইংরাজী। কি আর করি, তাই জানালা দিয়ে পাহাড় দেখতে দেখতে চলেছি। তাছাড়া বাসের ভিতর টেপ্‌রেকডারে পুরোন দিনের ভাল হিন্দীগান বাজছিল তাও শুনছি।

একটু বাদে এক ভদ্রলোক এসে আমার ডানপাশে বসে বললেন—"বোলিয়ে শ্যামাপদজী, এনি প্রব্লেম?" তাকিয়ে দেখি লোকটি কুলুরাম—দিল্লীতে বাসের মাথায় যে লোকটি শুয়েছিল। এখন দিনের আলোয় ভালো করে তাকিয়ে দেখি লোকটি সাড়ে চার ফুটের মত লম্বা, রং ফরসা অনেকটা নেপালীদের মত দেখতে। পরে শুনেছিলাম কৈলাস-মানস সরোবর রাস্তার ধারে সিয়দাং নামক গ্রামে ওর বাড়ী। মনে ভাবলাম কুলুরাম স্থানীয় লোক, এর কাছে পথের অবস্থা ও আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হবে কিনা জেনে নেওয়া ভাল।

কথাবার্তা সবই হিন্দীতে হয়েছিল, এখন বাংলায় লিখছি।

আমি ঃ আচ্ছা কুলুরামজী, আপনি ত কৈলাসের পথে অনেকবার লিপুলেক পাস পর্যন্ত গেছেন, এখন আমাকে দেখে বলুন ত আমি যেতে পারব কিনা ?

কুলুরাম ঃ কেন পারবেন না ? কখনও মনে ভয় আনবেন না। সব সময় মন যাতে আনন্দে থাকে সেই চেষ্টা করবেন।

আমি ঃ শুনেছি প্রায় তিনশ কিলোমিটার হাঁটতে হবে এবং প্রথম দিনের চড়াই নাকি খুবই কষ্টকর ?

কুলুরাম ঃ প্রথম দু-চারদিন হাঁটতে একটু কষ্ট হবে ঠিকই তবে পরে ঠিক হয়ে যাবে। তবে প্রথম দিনের যা চড়াই তাতে প্রত্যেকের দশ কেজি ওজন কমে যাবে।

আমি কথাটা শুনে একটু ভয় পেলাম. তারপর বললাম ঃ দেখুন আমি কৈলাস যাত্রার জন্য গত পাঁচ বছর যাবৎ রোজ ভোর বেলায় চার পাঁচ কিলোমিটার হাঁটা অভ্যাস করেছি। আপনার কি মনে হয় ঐ হাঁটার ফলে আমার পাহাড়ে পথ হাঁটতে সুবিধা হবে ?

কুলুরাম ঃ তবে তো আপনার কোন ভাবনাই নেই। আমি বলছি, আপনি নিশ্চয়ই যেতে পারবেন।

কথাটা শুনে আশ্বস্ত হলাম। এরপর নানা গল্প করে আমরা সময় কাটাতে লাগলাম।

কিছু পরে এক জায়গায় বাস থামল। চারিদিকে উঁচু সবুজ পাহাড়ে ঘেরা। ডান দিকে রাস্তা থেকে খাড়া পাহাড় উঠে গেছে। বাঁদিকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে নদী পর্যন্ত। নদীর পরই হাজার খানেক ফুটের সবুজ পাহাড়ের প্রাচীর। সেই নদীর এই তীরে কতগুলি মন্দির। বাস থেকে নেমে ঢালু পথ থেকে নেমে চলি সেই মন্দির দেখতে। ছোট কাঠের পুলে জনস্রোত পার হয়ে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা মন্দির চত্বরে প্রবেশ করলাম। চার পাঁচটি মন্দির—তার মধ্যে সন্তোষী মাতা, হনুমানজী, লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতি মন্দির দেখতে পেলাম। মন্দিরগুলি পাথর ও সিমেন্টের তৈরী। লাল ও হলদে

রং করা। মন্দির চত্বরে কলের জল ও ইলেকট্রিকের আলো আছে। শুধু এখানেই নয় কুমায়ুন অঞ্চলে বাসে যতদূর গিয়েছি, প্রত্যেক জায়গায় ইলেকট্রিকের আলো দেখেছি। পাহাড়ের চূড়ার কাছে একটি মাত্র বাড়ী আছে। সেই বাড়ীতেও ইলেকট্রিকের আলো আছে। মনে ভাবি কত পরিশ্রমের ফলেই না এটা সম্ভব হয়েছে।

বিকেল চারটে নাগাদ ভাওয়ালিতে পেঁছলাম। ভাওয়ালি একটি ছোট পাহাড়ী শহর। তিনটি রাস্তার সঙ্গম স্থলকে কেন্দ্র করে ভাওয়ালির অবস্থান। যে রাস্তায় যাচ্ছিলাম, ভাওয়ালিতে সেই রাস্তা দু-ভাগ হয়ে গিয়েছে। বাঁদিকে আলমোড়া, ডান দিকে ভীমতাল। রাস্তার দু-ধারে ফলের দোকানই বেশী। তাতে আপেল, আখরোট, পীচ, ন্যাসপাতি প্রভৃতি থরে থরে সাজান। যাত্রীরা ফল কিনতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। দুটি চায়ের দোকান আছে দেখে, চায়ের দোকানের দিকে যাচ্ছিলাম। কুন্দুরাম বাধা দিয়ে বলল "চা খেয়ে কোন লাভ নেই, আমার সঙ্গে আসুন।" এই বলে ফলের দোকানে গিয়ে কিছু সিঙ্গাপুরি কলা কিনে নিজে কিছু নিল, আমাকে কিছু দিল। ড্রাইভার দশ মিনিট সময় বরাদ্দ করেছিল। আজই আমাদের বাগেশ্বরে পেঁছতে হবে। রাস্তাও কম নয়। দিল্লী থেকে বাগেশ্বর ৪৫৮ কিমি। পাহাড়ী পথে একদিনে যাওয়া কষ্টকর কারণ পাহাড়ী পথে রাত্রে বাস চালানো নিরাপদ নয়।

চলতে চলতে এক সময় আলমোড়া পার হয়ে গেলাম। আলমোড়া সম্পর্কে আমার আগ্রহ থাকলেও বাসের জানালা দিয়েই যা কিছু দেখলাম মনে হল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সব দোকান। স্থানীয় লোকেরা বাসের সামনের বোর্ডটি দেখছে আর চোখে মুখে ফুটে উঠছে একটা সম্ভ্রমের ভাব। ভাওয়ালী থেকে আলমোড়া ৫৫ কিলোমিটার।

সন্ধ্যার কিছু আগে কৌশানীর তিন রাস্তার মিলন স্থানে গাড়ী থামল। কৌশানী থেকে বাগেশ্বর যাবার দুটি পথ আছে। নীচের রাস্তায় একটি মিলিটারী ট্রাক খারাপ হয়ে পড়ে থাকার ফলে রাস্তা বন্ধ; যেতে হবে উপরের রাস্তা দিয়ে। ট্যাক্সি তিনটি তখনও এসে

পৌঁছায়নি তাই অপেক্ষা করতে হল। যাত্রীদের চা-পান পর্ব সারা হতে ট্যাক্সি এসে গেল। তারপর আবার যাত্রা শুরু হল। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম তার বাঁদিকে একটি খাদি বস্ত্রের দোকান, ডানদিকে চায়ের দোকান ও দোতলা হোটেল। কৌশানী একটি বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্র এবং এখানে একটি গান্ধী আশ্রম আছে। শুনেছিলাম এই কৌশানী থেকে হিমালয়ের ত্রিশূল প্রভৃতি নাম করা চূড়া-শৃঙ্গগুলি দেখা যায়। কিন্তু এই প্রাক-সন্ধ্যায় যে দিকে তাকাই সে দিকেই গাঢ় কুয়াশার প্রলেপ, কিছুই দেখা যায় না। এখানে একটু শীত বোধ হতে লাগল।

কৌশানী পাহাড়ের চূড়ার কাছ দিয়ে বাস উঠতে লাগল। কুলুরাম এখনও আমার পাশে বসে। কুলুরাম বলল—"কাল সকালে বাগেশ্বর থেকে হিমালয়ের নাম করা শৃঙ্গগুলি দেখতে পাবেন।" বাসের মধ্যে দিল্লীর যাত্রীরা ওয়ার্ড মেকিং খেলতে ব্যস্ত; হাসি-ঠাট্টা, হৈ-হুল্লোড়ে গাড়ীর ভিতরটা মুখরিত। আমি এক মনে আগামী দিনের যাত্রা পথের কথা চিন্তা করে যাচ্ছি। কারণ কৈলাস পথের দুর্গমতার কথা আমার ভাল ভাবে জানাছিল। হঠাৎ খেয়াল হয় বরফের রাজ্যে কালো চশমা খুবই দরকার, কিন্তু সঙ্গে আনা হয়নি। কোথায় পাওয়া যাবে এই কথা কুলুরামকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলে, ধারচুলায় পেয়ে যাবেন। যাইহোক বাইরে আর কিছু দৃষ্টি চলে না, গাঢ় অন্ধকার নেমেছে। শুধু কাছে ও দূরের পাহাড়ের গায়ের বাড়ীগুলির বৈদ্যুতিক আলোগুলি আমাদের দেওয়ালীকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

গরুড় নামক একটি স্থান পার হবার খানিক পরে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ বাগেশ্বরে প্রবেশ করলাম। রাত্রে বাসের ভিতর থেকে জায়গাটি ভাল বোঝা গেল না। শহরের মধ্যে উঁচু নীচু কিছু পথ পার হয়ে রাস্তা থেকে কিছুটা নেমে বাগেশ্বর টুরিষ্ট রেষ্ট হাউসের সামনে গাড়ী দাঁড়াল। উত্তরে মুখ করে পূর্ব পশ্চিমে লম্বা দোতলা এই রেষ্ট হাউস। সামনে কাঁচের দরজা দিয়ে ঢুকেই বাঁদিকে

রিসেপশন কাউন্টার, ডান দিকে ডাইনিং হল। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে বাঁদিকে পাঁচখানি ঘরের পরে একটি বড় হল ঘরের ডর্মেটরি। আমি একটা সীট দখল করলাম। আধুনিক খাট টেবিল, ডানলোপিলোর গদি-বালিস, বাথরুমে ঠাণ্ডা গরম জল, খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

রেষ্ট হাউসে ঢোকা অবধি কাছেই একটা জল-প্রপাতের মত শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। আজ ১লা সেপ্টেম্বর। বাগেশ্বরে বেশ শীত বোধ হতে লাগল। মালপত্র সব বাসের মাথায় বাঁধা আছে সঙ্গে শুধু সাইড ব্যাগটি। রাত্রে কি হবে তাই ভাবতে থাকি। বাগেশ্বরের উচ্চতা প্রায় ৬০০ মিটার।

বাগেশ্বর রেষ্ট হাউসে খাওয়ার ব্যবস্থা অতি সুন্দর। খাওয়ার পরে প্রত্যেক যাত্রীকে ক্যামেরার নম্বর দিয়ে একটি ইনার লাইন পারমিটের দরখাস্তের ফরম্ পূরণ করতে হল। সারাদিন বাসের ধকলে শরীর খুবই ক্লান্ত, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসতে চায়। রেষ্ট হাউসের এক কর্মী প্রত্যেকের খাটে একটি করে নতুন কম্বল দিয়ে গেল। আমার ভাবনা দূর হল। পরে ঘুমের আয়োজন করতে লাগলাম। হ্যাঁ একটা কথা এখানে বলে রাখি, যেটা আগে বলা উচিত ছিল। ৩৮ জন যাত্রীর মধ্যে ৮জন বাঙালী ছিলাম বাকীরা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের। আমি ছাড়া ভট্টাচাযদা, ঢালিদা, অর্চনাদি ও ডলিদির কথা আগেই বলেছি। এছাড়া আছেন কলকাতার ঘোষদা, বয়স ৬৬, বেঁটেখাটো ফরসা মানুষটির কৈলাস যাত্রায় অপরিসীম উৎসাহ এবং পৃথিবীর বহুদেশ ঘুরেছেন। আছেন মুখার্জীদা, বেহালায় বাড়ী। রিটায়ার্ড মানুষ বয়স ৬০ বৎসর কিন্তু অনেক তরুণের চেয়ে শক্ত। আর আছেন চৌধুরীদা, বয়স ৫৫।৫৬ ছিপ্‌ছিপে কালো চেহারার মানুষ, রেলকর্মী।

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙার কিছু পরে স্বামিজীকে প্রণাম করতে গেলাম। দু-তিনটি ঘরের পরেই উনি ছিলেন। ঘরে ঢুকে দেখি স্বামিজী খালি গায়ে জানালার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে

আছেন। প্রণাম করবো কি? আমিও সেই মানুষ সমান কাঁচের জানালা দিয়ে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে বাধ্য হলাম! সামনে সমস্ত আকাশ জুড়ে দেখা যাচ্ছে বড় বড় তুষার শৃঙ্গ, সকালের রোদে শৃঙ্গের রং কাঁচা সোনার মত। জীবনে প্রথম এই দৃশ্য দেখলাম বলে প্রথমে ছবি বলেই মনে হয়েছিল, খানিক বাদে বুঝতে পারলাম দৃশ্যটি বাস্তব। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর স্বামিজীকে প্রণাম করলাম। উনি মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, "ঐ দেখ্ বেটা নন্দাদেবী, ইয়ে হ্যায় পঞ্চচুলি।" আমি অবাক বিস্ময়ে শৃঙ্গগুলির সাথে পরিচিত হলাম।

নীচে নেমে এসে চা-চপ সহযোগে ব্রেক ফাস্ট সহ সেরে বুঝতে পারলাম যাত্রা শুরু হতে কিছু দেরী আছে। আজকের গন্তব্যস্থল ধারচুলা,—বাগেশ্বর থেকে ১৫৯ কিমি। ভাবলাম এই সুযোগে বাগেশ্বরের প্রাচীন মন্দিরটি দেখে নেওয়া যাক। ব্যাগটি কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বাগেশ্বরে সরযূ ও গোমতী দুই নদীর সঙ্গমস্থলের উত্তরদিকে বাগেশ্বর মহাদেব প্রাচীন মন্দির এবং দক্ষিণদিকে ট্যুরিষ্ট রেষ্ট হাউস। আগের দিন রাত্রে যে শব্দ শোনা যাচ্ছিল সেটি আর কিছুই নয়, দুই নদীর মিলিত জলস্রোতের শব্দ। রেষ্ট হাউস থেকে একটু উপরে পীচের রাস্তায় উঠে লোহার পুলে সরযূ নদী পার হয়ে বাজারের মধ্য দিয়ে ডানদিকে নেমে গেলে সঙ্গমের ধারেই মন্দির। একটি ঘেরা জায়গায় বাগেশ্বর মহাদেবের মন্দির। ডান দিকে আরও একটি ছোট মন্দির দেখতে পেলাম। বাগেশ্বরের মন্দির প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু এবং খুব প্রাচীন মনে হল। মন্দিরের সামনে একটি লোহার এঙ্গেলে শখানেক ছোট বড় ঘণ্টা বাঁধা এবং উল্টোদিকে একটা মিউজিয়াম। সেখানে পুরাকালের পাথরের মূর্ত্তি ও বিভিন্ন সামগ্রী রাখা আছে। হাতে সময় কম তাই তাড়াতাড়ি দেখা শেষ করে রেষ্ট হাউসে ফিরে এলাম।

সকাল আটটা নাগাদ ধারচুলার উদ্দেশ্যে যাত্রা হল। একদিকে পাহাড় অন্য দিকে খাদ। মাঝে রাস্তায় গাড়ী ছুটে চললো।

পথের সৌন্দর্য বর্ণনাতীত। দুপাশের পাহাড়ে ঘন চীর গাছের জঙ্গল। কোন কোন গাছের গুঁড়িতে ছোট টিনের পাত্র বাঁধা, চীর গাছ থেকে রজন তৈরী হয় শুনেছি। পথের ধারে ছবির মত গ্রাম ও মাঝে মাঝে ছবির মত ঝর্ণা দেখতে পাওয়া যায়। এক দিকে উঁচু পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ে রাস্তা পার হয়ে অন্য দিকে খাদে নেমে যায়। ঝর্ণার গর্জনে কানে তালা লেগে যাবার উপক্রম হয়। কর্তৃপক্ষের কথা ছিল ধারচুলার যাবার পথে প্রাচীন বৈদ্যনাথ মন্দিরটি দেখানোর। কিন্তু কি কারণে জানি না সেটা বাতিল করা হল। দেখতে পেলে ভালই হোত, জানিনা আর কোন দিন দেখা হবে কিনা? অপরূপ পাহাড়ী পথের সৌন্দর্য সুধা গ্রহণ করতে করতে বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ চকোরী রেষ্ট হাউসে পৌঁছালাম। সেখানেই মধ্যাহ্ন ভোজন হবার কথা। বাগেশ্বর আলমোড়া জেলায় হলেও চকোরী কিন্তু পিথোরাগড় জেলায় অবস্থিত। একটি পাহাড়ের মাথার উপর অবস্থিত এই রেষ্ট হাউসের পিছনে রাস্তা আর সামনে হাজার দুয়েক ফুট খাদ নেমে গিয়ে ১৫।১৬ মাইল দূরে গিয়ে আকাশ ছোঁয়া এক পাহাড়ে গিয়ে মিশেছে। নীচে কিছু সমতল জায়গায় লাল-হলদে কিছু ফসলের ক্ষেত ও দেশলাই বাক্সের মত দু-চারটি কটেজ দেখা যায়। এক কথায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এখানে অনুপম। রেষ্ট হাউসের চারিপাশ বড় বড় গোলাপ ও অন্যান্য ফুলে ভরা।

মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে যাত্রা শুরু হবার পর সাড়ে বারটা নাগাদ তিতিহাট নামক এক জায়গায় পৌঁছালাম। এখানে ইনার লাইন পারমিট সংগ্রহ করার জন্য এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। মানিন্দার কাগজপত্র নিয়ে চলে গেলেন। যেখানে বাস থেমেছে সেই রাস্তার দুপাশে চায়ের, ফলের দোকান ও হোটেল আছে। একতলা সমান উপরে একই সমান্তরালে আরও একটি রাস্তায় প্রধান বাজার। দুটি রাস্তার মধ্যে সংযোগ আছে।

এক ঘণ্টা পর গাড়ী ছাড়ল। কিছু দূরে একটি রাস্তা উপরে আসকোটের দিকে গেছে। নীচের রাস্তা দিয়ে জৌলজিবি চেক্-

পোস্টের সামনে হাজির হলাম। প্রত্যেকের ক্যামেরা দেখিয়ে ছাড়পত্র পাওয়া গেল। জৌলজিবি কালী নদীর ডানতীরে অবস্থিত। বাঁদিকে জঙ্গল ভরা খাঁড়া পাহাড়, ডান দিকে জঙ্গলে ভরা খাদ বহু নীচে কালী নদীতে মিশেছে। নদীর অপর তীরে নেপাল। এই কালী নদী লিপুলেক্ পাশের কিছু আগে পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকবে। ক্রমে বালুয়াকোট, কালিকা গ্রাম পার হয়ে সুন্দর পাহাড়ী শহর ধারচুলায় হাজির হলাম। বেলা তখন ৪টা।

কালী নদীর ডান তীরে অবস্থিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ধারচুলা শহরের রাস্তাগুলি খুবই উঁচু নীচু। শহরের মাঝখানে কালী নদীর তীরে কুমায়ুন নিগমের যাত্রী নিবাসে আজ রাত্রি বাস। নদীতীরের রাস্তা থেকে ৭০ ফুট পশ্চিমে উঠে যাত্রী নিবাস এবং রাস্তা থেকে ৭০ ফুট পূর্বে কালী নদী। রাস্তা থেকে যাত্রীনিবাসের দরজা পর্যন্ত খড়ি দিয়ে আলপনা আঁকা। একটি ছোট সিনেমা হলের মত টিনের সেড্ দুভাগে ভাগ করে যাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেঝেতে স্টিলের খাটের উপর পরিষ্কার বিছানা ও বালিস। ২০০ গজের মত চওড়া কালী নদী গর্জন করে ছুটে চলেছে। জল ঘোলাটে সাদা। নদীগর্ভ ছোট বড় গোলাকার অজস্র পাথরে ভর্ত্তি। নদীর অপর তীরে নেপালের বহুবর্ণের বাড়ীগুলি সুন্দর দেখতে লাগে। রেষ্ট হাউসের একটু বাঁদিকে নদীর উপর একটি লোহার ঝোলা পুল। ঠিক লছমন ঝোলার মত। আমি স্থানীয় হরিশ নামে একটি ছেলেকে নিয়ে পুল পার হয়ে নেপালে গেলাম। ডান দিকে একটু উঠে দুপাশে সারি বন্ধ দোকানে থরে থরে বিদেশী জিনিস সাজান। একটি বিদেশী চশমা কিনলাম। পুলের দু-প্রান্তে ভারত ও নেপাল সরকারের চেকপোষ্ট আছে।

এই ধারচুলা থেকে যাত্রীদের একটি অসস্তিকর জিনিসের সম্মুখীন হতে হল, সেটি হচ্ছে রোজ সন্ধ্যায় মেডিকেল চেক্আপ। সন্ধ্যা ছয়টায় ধারচুলা হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তারী পরীক্ষার পর লোড্শেডিং ও বৃষ্টি মাথায় নিয়ে দেড় ঘন্টা পরে যাত্রী নিবাসে ফিরলাম।

ধারচুলার অবস্থানটি যেন একটি অতি বিশালাকায় কুয়োর মধ্যে। চারিদিকে আকাশ জোড়া পাহাড়ের প্রাচীর, মাঝখানে শহর। রাত্রের আকাশে উপরে খানিকটা গোলাকার জায়গায় তারাগুলি জ্বলতে দেখা যায়। আর চারিদিকে কালো পাহাড়। সেই পাহাড়ের গায়ে রাস্তায় রাত্রে হেড-লাইট জেলে গাড়ীগুলি যখন চলাচল করে, মনে হয় গাড়ীগুলি বুঝি আকাশেই চলছে।

ধারচুলা যাত্রীনিবাসে পাহাড়ে হাঁটার উপযোগী প্রয়োজনীয় সব জিনিসই ভাড়া পাওয়া যায়। আমি একটি পালকের স্লিপিং ব্যাগ পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ভাড়া করলাম। যাত্রীদের মালপত্র রাত্রে ওজন করা হল। পঁচিশ কেজি পর্যন্ত কোন বাড়তি খরচা লাগে না কিন্তু আমার মালের ওজন হল সাড়ে আট কেজি। আমার পাশে বসে আসা কুলুরাম এখানে মালপত্র ওজন ও তদারক করতে খুবই ব্যস্ত। তারই ফাঁকে প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করে যাচ্ছে, "বলিয়ে শ্যামদাসজী, এনি প্রব্লেম ?" হেসে বলি, আপাততঃ কোন প্রব্লেম নেই। ধারচুলার পরে কুলুরাম যাত্রীদের সঙ্গে থাকেনি। কিন্তু ওর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে একথা মালবাহক বা ঘোড়াওয়ালা যে শুনেছে সেই যাত্রা পথে আমাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছে। রাত্রে অত্যাধিক উৎসাহে ঘুম হল না বললেই চলে।

৩রা সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার। ভোর পাঁচটার আগেই যাত্রার আয়োজন শুরু হয়ে গেল। আজকের যাত্রা বাসে তাওয়াঘাট পর্যন্ত তারপর পায়ে হাঁটা পথ সোসায় শেষ হবে। ধারচুলা থেকে তাওয়াঘাট ১৯ কিমি। সাড়ে পাঁচটায় বাস ছাড়লো, সামনে একটি পুলিশের ট্রাক। পথে কোন লুটতরাজ বা ছিনতাই না হয় তার জন্য তাওয়াঘাট থেকে কালাপানি পর্যন্ত পুলিশের একটি দল যাত্রীদের সঙ্গে থাকবে। বাঁদিকে খাড়া পাহাড়, মাঝে মাঝে, ধ্বস নেমেছে। আবহাওয়া খুবই ভিজে ভিজে। সকাল ৭টা নাগাদ কালী নদী ও ধৌলি গঙ্গার সঙ্গমস্থল তাওয়াঘাটে বাস থামলো। নেমে দেখি ডানদিকে কালী নদী, সামনে ধৌলী নদী, বাঁদিকে সারিবদ্ধ বাড়ী ও দোকান। মাঝে

সমতল জায়গাটিতে অনেক ঘোড়া, কুলি, স্থানীয় লোকের ভীড়, হাঁক ডাক চেঁচামেচিতে জায়গাটি রীতিমতো সরগরম। আকাশে গাঢ় কুয়াশার ভাব, সূর্যের আলো নেই। এখানে পাহাড়ী পথে চলার জন্যে একটি লাঠি পেলাম। ঘোষদা কলকাতা থেকে ২০টি তালপাতার টুপি নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই টুপি একটি পেলাম, যেটি সমগ্র যাত্রাপথে খুব উপকারে এসেছিল। কয়েকজন যাত্রী পাহাড়ে ওঠার জন্য ঘোড়া ভাড়া করলেন। ঘোড়ার ভাড়া প্রতিদিন ১০০ টাকা। হরিশ ছেলেটি আমাদের সঙ্গে তাওয়াঘাট গিয়েছিল, সে আমাকে বললো যে আমার সাইট ব্যাগটি সে বয়ে নিয়ে যেতে রাজী আছে, তার জন্য প্রতিদিন ৪০ টাকা দিতে হবে। আমার অক্ষমতার কথা তাকে জানাতে সে অন্য যাত্রীর খোঁজে গেল। আমার ব্যাগে প্রয়োজনীয় জিনিস ও জলের বোতল মিলিয়ে ৪।৫ কেজি ওজন হবে। পাহাড়ী পথে এক কেজি ওজন দশ কেজি মনে হয়, একথা আমার জানা থাকলেও উপায় যখন নেই, তখন নিজেকেই বইতে হবে।

মানিন্দর সিং আমাদের সরকারী দলনেতা হলেও স্বামিজী দলের প্রকৃত পরিচালক। উনি হাঁটা শুরু করার জন্য তাগাদা দিতে লাগলেন। নতুন জায়গা পাহাড়ী পরিবেশ দেখতে ভাল লাগছিল কিন্তু স্বামিজীর তাড়ায় পথে পা বাড়াতে হল। ধৌলী গঙ্গার উপর কাঠের পুলে পা দিতেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, গোটা শরীরটাকে জাপটে ধরল। ডানদিকে দুটি নদীর সঙ্গমে প্রচণ্ড গর্জন। পুল পার হয়েই আরম্ভ হয়েছে এক সুউচ্চ পাহাড়, অনেক চেষ্টা করেও যার চূড়া দেখা যায় না। চড়াই পথে উঠতে শুরু করলাম, আমার জীবনে প্রথম চড়াইয়ে ওঠা। প্রথমটায় খুবই উৎসাহ ছিল কিন্তু কিছুদূর ওঠার পর মনে ভয় দেখা দিল—উঠতে পারবো তো? ক্ষণিকের ভয়! পরক্ষণেই ভয়টাকে ঝেড়ে ফেলে উঠতে শুরু করলাম। এত দিনের স্বপ্ন সার্থক হতে চলেছে; সামান্য কষ্টের জন্য পিছিয়ে যাব?—কখনোই না। অন্য যাত্রীদের দেখাদেখি লাঠিতে ভর দিয়ে উঠতে শুরু করলাম। পাহাড়ের গা কেটে পাথর বসিয়ে ৪।৫ ফুট চওড়া সিঁড়ির মত পথ

করা আছে। সেই পথ এঁকে বেঁকে পাহাড়ের মাথায় উঠে গেছে। লতা গুল্মজাতীয় গাছপালায় পাহাড়ের গা সবুজে। আকাশে মেঘ নেই তবুও কুয়াশার মত ভাব। মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চড়ে পিছন থেকে যাত্রীরা উঠছেন, পাহাড়ের দিকে সরে দাঁড়িয়ে রাস্তা ছেড়ে দিতে হচ্ছে। একটা পাথরে একটু বসে পড়লাম। মুখ উঁচু করে যত দূর দেখা যায়, ততদূর পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকে বেঁকে রাস্তা উঠে গেছে। উপরে তাকান বন্ধ করলাম, তাকাতে যখন ভয় লাগছে তখন না তাকানোই ভাল। পাহাড়ে ওঠার পক্ষে এটা খুব ভাল ওষুধ। বইয়ে পড়েছি এই চড়াইটাকে বলে থানিধরের চড়াই। কিছু পরে দেখি ভট্টাচাযদা ও ঢালিদা গল্প করতে করতে উঠে আসছে। ওরা কাছে এলে আবার চলা শুরু করলাম। নানা হাসির কথা বলে লোককে আনন্দে রাখা ভট্টাচাযদার স্বভাব, এখন চলার পথেও নানা রকম মজার কথা হচ্ছে। আরও কিছু উপরে ওঠার পর পঞ্চম ব্যাচের দু-একজন যাত্রীকে নেমে আসতে দেখা গেল। আমরা যে বাসে এসেছি, সেই বাসে ওঁরা ধারচুলা ফিরে যাবেন। ওদের কাছে আমরা তিব্বত ও কৈলাস-মানস সরোবর বিষয়ে খোঁজ খবর নিয়ে নিচ্ছিলাম। নীচে তাকিয়ে দেখি এত উপরে উঠেছি যে নীচের কালী নদী ও তার তীরে পীচের রাস্তা সাদা ও কালো সুতোর মত মনে হচ্ছিল। পথের ডান দিকে একটি বিশ্রামাগারের মত দেখতে গেলাম। এই জায়গাটি চড়াইয়ের মাঝামাঝি, পাশে ঘণ্টা বাঁধা ছোট মন্দির। আরও ঘণ্টা-খানেক ওঠার পর চড়াই শেষ হ'ল। এই জায়গার নাম থানিধর। ডানদিকে একটি ছোট গাছের পর খানিকটা ফাঁকা জায়গায় একটি চায়ের দোকান। এক বৃদ্ধা পাহাড়ী মহিলা চা তৈরী করছেন, সহকারী একটি বাচ্চা ছেলে। ৫০ পয়সায় এক কাপ চা খেয়ে একটু বিশ্রাম করে নিলাম। তাওয়াঘাটের উচ্চতা ৩০০০ ফুট, আর থানিধরের উচ্চতা ৯০০০ ফুট। যাত্রার প্রথম স্তরে তিন মাইলে ৬০০০ ফুট উঠতে হয়েছে। কষ্ট কতটা হয়েছে পাঠক সহজেই অনুমান করতে পারবেন।

চায়ের দোকানের পরে রাস্তা সামান্য উঠেছে। ডানদিকে চার-পাঁচটি বাড়ীঘর, তারপর বেশ চওড়া সমতল রাস্তা। প্রায় দেড় মাইল এই রাস্তায় চলার পর পাঙ্গু গ্রামে হাজির হলাম। গাছের ছায়ায় ঢাকা রাস্তায় বাঁদিকে উঁচুতে গ্রামের ঘর বাড়ী। গ্রামের মাঝামাঝি পথের ডানদিকে কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রীদের জন্য বিশ্রাম গৃহ রয়েছে, সেটি বন্ধ দেখলাম। গ্রামের ছোট ছেলে মেয়ে যাত্রীদের দেখা মাত্র "বাবুজী নমস্তে" বলে সম্ভাষণ জানাল, প্রত্যুত্তরে আমরাও নমস্তে বললাম। গ্রামের শেষ প্রান্তে পাঠশালার শিক্ষক মশাই পড়ান ছেড়ে আমাদের নমস্কার জানান; পড়ুয়ারা পড়া ফেলে অবাক চোখে যাত্রীদের দেখতে থাকে। পাঙ্গুগ্রাম শেষ হতে হুড়মুড়িয়ে অনেকখানি নামার পর একনদীর তীরে এসে দাঁড়ালাম। নদী বক্ষ বড় বড় সাদা দুধের মত অজস্র পাথর খণ্ডে ভর্ত্তি। এক জায়গায় পাথরের উপর কাঠ ফেলে নদীর স্রোত পার হবার ব্যবস্থা করা আছে, সেখানে অতি সাবধানে পার হলাম। চারিদিকে উঁচু সবুজ পাহাড়। নদী পার হয়ে আবার এক পাহাড়—সেই পাহাড়ের মাথায় সোসা গ্রাম। সামনে মাথার উপর চড়া রোদ, খুবই কষ্ট। বোতলের জলও শেষ। অনেক যাত্রী এসে আশেপাশে বসে পড়লেন, সকলের চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ। ঢালিদা খেলোয়াড় মানুষ, তিনিও এসে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়লেন। পেটে দারুণ ক্ষুধার জ্বালা; সোসায় না পেঁছিলে আহার আশ্রয় কিছুই মিলবে না। তাই উঠতে হল। আরও এক মাইল সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠে সোসায় প্রবেশ করলাম। সোসার উচ্চতা ৭,২০০ ফুট। গ্রামের ভিতর কাদা প্যাচপেচে পাথুরে রাস্তায় একটু গিয়ে ডানদিকে ঘুরে রেস্ট-হাউস। পাহাড়ের মাথায় তিন কামরার একটি টিনের বাংলো, সামনে তিনটি তাঁবু, পাশে পায়খানা বাথরুম। মাঝের ঘরটিতে জায়গা রাখলাম। আমি ছাড়া ভট্টাচাযদা, ঢালিদা বোম্বাই-এর ডাক্তার শুক্লা ও শেঠজী এই ঘরে ছিলাম। সকাল ৭টায় তাওয়াঘাট ছেড়েছিলাম, এখন বেলা আড়াইটা। পদযাত্রার প্রথম দিনে ১৪ কিমি খাড়া পাহাড়ে উঠে শরীরের সব শক্তি নিঃশেষ, তাই খাওয়া-

দাওয়ার পর একটু শুয়ে পড়লাম। তিনটে বেজে গেছে কিন্তু কিছু যাত্রী এখনও এসে পৌঁছননি।

আধ ঘণ্টা পরে বাইরে হাঁকডাক শুনে বেরিয়ে দেখলাম ঘোড়ার পিঠে যাত্রীদের মালপত্র এসে গেছে, প্রত্যেকে নিজের ব্যাগ খুঁজে ঘরে ঢোকাতে ব্যস্ত। এতক্ষণে সমস্ত যাত্রী এসে গেছেন।

বিকেলের দিকে আকাশে মেঘ জমতে শুরু করল। বাংলোর সামনে দিগন্ত বিস্তৃত খাদ ; সেই খাদে ছোট ছোট মেঘের আনাগোনা। একটু শীত বোধ হতে থাকায় ঘরে ঢুকে ঢাকাঢুকি দিয়ে বসে পড়লাম। চা খাওয়ার পর আরম্ভ হল মেডিকেল চেক্‌আপ। আমার রক্তের চাপ ১৬৫-তে উঠেছে দেখে ডাক্তারবাবু পরের দিন জোরে পথ হাঁটতে নিষেধ করলেন। এখানে বলে রাখি তাওয়াঘাট থেকে ৭ জন রাইফেল ধারী পুলিশ, একজন সরকারী ডাক্তার ও একজন সহকারী যাত্রীদের সঙ্গে হেঁটে চলেছেন। একটি মোবাইল ওয়্যারলেস সেট সঙ্গে চলেছে, পথে কোন বিপদ আপদ হলে সঙ্গে সঙ্গে ধারচুলা অথবা দিল্লীর সাথে যোগাযোগ করার জন্য।

সন্ধ্যাব সময় টিপ্‌টিপ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। ঘরের দরজা বন্ধ করে সকলে গল্প গুজবে মেতে থাকি। পাশের ঘর থেকে স্বামিজীও বাবাজী এসে আলোচনায় যোগ দেন। বাবাজী ধর্মমূলক আলোচনা শুরু করেন। গ্লাসে গ্লাসে গরম স্যুপ এসে হাজির হয়। স্যুপের সাথে আসর জমে ওঠে।

রাত্রে খাওয়ার পর সঙ্গে আনা শালটি গায়ে দিয়ে মোটা কার্পেটের ওপর শুয়ে পড়ি। ঠাণ্ডা বেশী হবে না ভেবে শ্লিপিং ব্যাগ খোলা হয় না, কিন্তু মাঝরাতে খুব ঠাণ্ডা পড়ে ফলে ভাল ঘুম হয় না।

পরের দিন সকালে গরম চা এনে মালবাহকরা ঘুম ভাঙাল। বাইরে বেরিয়ে দেখি আকাশ মেঘে ঢাকা, টিপ্‌ টিপ্‌ বৃষ্টি পড়ছে। হাত মুখ ধুয়ে গরম পুরি-তরকারী ও এক গ্লাস বোর্নভিটা খেয়ে যাত্রা শুরু করার জন্য তৈরী হলাম। প্লাস্টিকের ওয়াটার প্রুপ গায়ে দিয়েছি, পায়ে ওয়াটার প্রুপ জুতো।

বাংলো থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে অনেকটা উৎরাই পথ। বৃষ্টির জলে পাথরের রাস্তা পিছল, টাল সামলে নামতে লাগলাম। একটি স্রোতস্বিনী নালা পার হয়ে অপর এক পাহাড়ের গা বেয়ে চলতে লাগলাম। সামান্য চড়াই। আধ ঘণ্টা পর পাহাড় শেষ হবার পর উৎরাই-য়ে নেমে গেল। পথের দুপাশে বড় বড় গাছ। কয়েকজন মেয়ে পুরুষকে কাজ করতে দেখে সামনের গাছটি কি গাছ জিজ্ঞেস করি। উত্তর পাই আখরোট গাছ, তবে এখনও কাঁচা—ফেরার পথে পাকা পাব। কিন্তু ফেরার সময় অন্য পথে ফিরতে হয়েছিল।

উৎরাই শেষে সবুজ ঘাসে ঢাকা আধ মাইল চওড়া ফাঁকা মাঠ। মাঠে বেশ কিছু ঘোড়া ও ভেড়া চরে বেড়াচ্ছে। বাঁদিকে একটু উপরে পাহাড়ের গায়ে কয়েকটি ঘর দেখতে পাওয়া গেল। সেই দিকে উঠে একটি আশ্রমে প্রবেশ করলাম। আশ্রমটির নাম 'নারায়ণ আশ্রম'। নারায়ণ স্বামী নামে এক মহাত্মা এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ডানদিকে অফিস ও যাত্রী নিবাস, সামনে একতলা সমান উঁচুতে মন্দির। মন্দিরটি দেখে মন্দির বলে মনে হয় না, মনে হয় ইউরোপের কোন কোন বাড়ী। দোতলায় দেবগৃহ। ভিতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। টর্চ জেলে দেবমূর্ত্তি দর্শন করতে হল। মাঝারি সাইজের নারায়ণ, লক্ষ্মী ও মহাদেবের রজত মূর্ত্তি। পূজারী কপালে তিলক দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। নীচে একতলায় ছোট মিউজিয়ামে কিছু পুরাকালের জিনিস, একটি প্রাচীন নটরাজ মূর্ত্তি, কিছু বাদ্য যন্ত্র ও একটি কৈলাসের প্রতিকৃতি দেখতে পেলাম। আশ্রমের চারিপাশ বিভিন্ন ফুল ও ফলের গাছে ঘেরা। এক কথায় অপূর্ব পরিবেশ।

আশ্রম কর্তৃপক্ষের দেওয়া গরম চা খেয়ে আবার যাত্রা শুরু হল। বৃষ্টি থেমে গেছে অনেকক্ষণ। জঙ্গলে ভরা রাস্তায় কিছুটা নেমে আবার একটু চড়াই। শিরখা গ্রামের এক মাইল আগে ঘন বিছুটি গাছের জঙ্গলের মাঝে এক দেড় ফুট চওড়া রাস্তায় চলতে হয়। একে বিছুটি গাছ তার উপর কাদার নীচে ছোটবড় গর্ত থাকার ফলে চলতে

খুবেই কষ্ট হয়। আধ মাইল এই পথে চলার পর একটু উঠে শিরখা গ্রামে প্রবেশ করলাম। পাহাড়ের গায়ে গ্রাম। গ্রাম থেকে এক ফার্লং P. W.D. রেষ্ট হাউসে যখন পেঁছলাম তখন বেলা ১১টা। সোসা থেকে শিরখা পাঁচ কিমি। প্রথমে তিনটি তাঁবু, একটু উঠে টিনের সেড্ দেওয়া চারখানি পাকা বাড়ী। সামনে একটু ফাঁকা জায়গার পর খাদ। এখানের উচ্চতা ৮০০০ ফুট। তাঁবুর মধ্যে আশ্রয় পেলাম, পাশে ঘোষদা। দুপুরে গ্রাম দেখতে বেরোলাম। পাহাড়ের গায়ে লম্বা তিনটি স্তরে গ্রাম। কয়েকটি দোকান আছে। সব কিছুই পাওয়া যায়। কৃষি ও পশুপালনই এখানকার অধিবাসীদের জীবিকা।

পরের দিন আমাদের যে পাহাড়টি যেতে হবে, রেষ্টহাউস থেকে সামনে সেটি দেখতে পাওয়া যায়। বিকেলে ভট্চাযদা ও স্বামিজীর সাথে পরের দিনের যাত্রাপথ নিয়ে আলোচনা করি। সামনে দশ হাজার ফুট উঁচু পাহাড়টি পরেরদিন পার হতে হবে শুনে ভট্চাযদা খুবই মুষড়ে পড়লেন। আমি বলি, ভয় পাবেন না। আপনি এখন আট হাজার ফুট উঁচুতে দাঁড়িয়ে আছেন, কাজেই আপনাকে মাত্র দুহাজার ফুট উঠতে হবে। আমার কথা শুনে ওঁর ভয় কিছুটা কমে। ক্রমে আকাশে মেঘ ছেয়ে আসে এবং রাত্রী নামতে শুরু করে।

পরদিন সকাল সাড়ে ছটায় ব্রেকফাষ্ট সেরে যাত্রা শুরু হয়। প্রায় দু মাইল পাহাড়ের গা বেয়ে উৎরাই পথ। তারপর আসে সমরি গ্রাম। রাস্তার দুপাশে দু-চারটি দোকান ও বাড়ীঘর। এই অঞ্চলের বাড়ীগুলি সাধারণত দোতলা হয়ে থাকে। পাথরের দেওয়াল, শ্লেট-পাথরের ছাউনি। নীচে গৃহপালিত পশু ও খাদ্য শস্য থাকে, উপরে লোকজন বাস করে। জানালাগুলি ছোট ছোট। যে অঞ্চল দিয়ে চলেছি সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের সমতলের লোকেরা বলে ভোটিয়া। কিন্তু এখানের অধিবাসীরা নিজেদের 'শক্' বলে পরিচয় দেয়। অনুমান করা হয় অতীতে কোন এক সময় এই সব ভোটিয়ারা কোন

কারণে রাজস্থান থেকে চলে এসে এই অঞ্চলে বসবাস শুরু করেছিল। এই অঞ্চলের প্রত্যেকেরই উপাধি সিং। অনেকে এদের কাশ্মিরী জেনারেল যোরাবর সিংএর অবশিষ্ট সৈনিকদের বংশধর বলেও মনে করেন। এই অঞ্চলের পুরুষদের পোষাক—ফুলপ্যাণ্ট, জামা, কোট, সোয়েটার ও টুপি। মহিলারা রাজস্থানীদের মত শাড়ী পরে, বিবাহিতারা এক খণ্ড সাদা কাপড়ে মাথা ঢেকে রাখে। এরা যে পাহাড়ী ভাষায় কথা বলে তার নাম 'রংবুলি'। কুমায়ুনের এই ভোটিয়া অঞ্চলটি দুই ভাগে বিভক্ত। থানিধর থেকে রুংলিং টপের নীচ পর্যন্ত অঞ্চলটিকে বলা হয় চৌদাসপট্টি এবং রুংলিং টপের পর থেকে কুটি গ্রাম পর্যন্ত অঞ্চলটিকে বলা হয় বিয়াসপট্টি। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা তিব্বতকে বলে 'উপর'। তিব্বতের জিনিস এই কথাটি বোঝাতে গেলে বলে 'উপরকা চিজ'।

সর্মারি গ্রাম পার হয়ে দেড় মাইল অল্প চড়াই। দু-চারটি ক্ষীণ জলস্রোত পার হতে হল। তারপর এক গগন স্পর্শী পাহাড়ের পাদদেশে এসে দাঁড়ালাম। এখানে একটি চায়ের দোকান আছে। দোকানের সামনে সাইনবোর্ড 'Tea-Shop Rungling' দোকানে একটু বসে একপ্লেট রাজমা সেদ্ধ এক টাকার এবং ৫০ পয়সার চা এক কাপ খাওয়ার পর শরীরে একটু শক্তি পেলাম। পাহাড়ী পথে চলতে ঘন ঘন ক্ষিদে পায়। এখন সকাল সাড়ে আটটা, গন্তব্য এখনও অনেক দূরে তাই উঠতে হল। দোকানের পরেই যে পাহাড়টি আরম্ভ হয়েছে, সেটি বড় বড় গাছের গভীরে জঙ্গলে ঢাকা। পাহাড়ের শীর্ষ দেশটির নাম রুংলিং টপ। চায়ের দোকানদারের কাছে জানতে পারা গেল অতীতে রুংলিং নামে এক সাহেব ঐ টপে উঠে রিভলবার দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন তাই নাম হয়েছে রুংলিং টপ। খাড়া তিন মাইল পথ উঠতে হবে তাই লাঠিতে ভর দিয়ে উঠতে থাকি। এখানে জঙ্গলে এত বন যে সূর্যের আলো প্রবেশ করে না। একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন ভাব, স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ। কিছু দূর ওঠার পর একটু বিশ্রাম করে আবার উঠতে থাকি। সঙ্গে ভট্টাচাযদা ও ডাঃ শুক্লা চলেছেন। নানা

গল্প গুজবে হাঁটার পরিশ্রম লাঘব হয়। ডাঃ শুক্লার পায়ে জুতোর ফোস্কা হওয়ায় খুঁড়িয়ে হাঁটছেন। এক সময় পাথরে পিছলে পড়ে যান। তাড়াতাড়ি হাত ধরে টেনে তুলে জিজ্ঞেস করি—"লেগেছে নাকি?' ডাক্তার বলেন না তেমন লাগেনি। বলি, আস্তে হাঁটুন। দলের সরকারী ডাক্তার এক সময় পিছন থেকে এসে আমাদের সঙ্গ ধরেন। ভট্‌চাযদা তাকে জিজ্ঞেস করেন, "ডাঃ সাব, আপ ফিট্ হ্যায়?" ডাক্তার হাসিমুখে জানান যে তিনি ফিট্ আছেন। ভট্‌চাযদা আমাকে বলেন, "বুঝলে, ডাক্তার ফিট্ থাকলে আমরাও ফিট্ থাকবো।" পথের দুধারে সরু বাঁশের ঝোপ নজরে পড়ে। মাছ ধরা ছিপ বোধহয় এই বাঁশ থেকে তৈরী হয়।

এক সময় পাহাড়ের মাথায় হাজির হই। ডান দিকে একটা টেলিফোনের পোষ্ট, বাঁদিকে পাথরের স্তুপের উপর শুকনো গাছের ডালে নানা রংয়ের কাপড়ের টুকরো বাঁধা। রুংলিং টপের উচ্চতা দশ হাজার ফুট হলেও নিঃশ্বাসের কোন কষ্ট হয় না। একটু বসে বিশ্রাম করে নিলাম। পাহাড়ের অপর দিক থেকে দশ বারটি ঘোড়া সমেত কয়েকজন সামরিক কর্মী উঠে এলেন। তাদের মধ্যে একজন বাঙালী পেয়ে একটু গল্প করে নিলাম। রুংলিং টপের উপর রাস্তা বাঁদিকে বেঁকে গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে উৎরাই নেমে গেছে। আস্তে আস্তে নেমে চলি। সঙ্গে ঘোড়া থাকলেও শ্রীরাম বাবা আমার সঙ্গে হেঁটে নামছেন, কারণ উত্‌রাই পথে ঘোড়ায় চড়ে নামা বিপদজনক। কিছু দূর নেমে বাবাজী ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েন। ক্লান্ত হবারই কথা। ৮৭ বৎসর বয়স। ঘোড়াওয়ালা এসে ঘোড়ায় তুলে নেয়। সকলে দল বেঁধে নেমে চলি। ভট্‌চাযদা বলেন, "খুব আরামসে নেমে চলেছে, কিন্তু ফেরার পথে এই উৎরাই যখন চড়াই হয়ে দেখা দেবে তখন মজা বুঝবে।" কথাটা চিন্তা করে সত্যই শঙ্কিত হতে হয়। উৎরাই পথেও গভীর জঙ্গল। কোন জন্তু জানোয়ার বের হয়ে পড়লেই বিপদ। এই রকম রাস্তায় প্রায়ই আড়াই তিন মাইল নামার পর একটি জলস্রোতের সামনে উৎরাই শেষ হয়। সামনে তাকিয়ে দেখি প্রায়

আধ মাইল পরে আরম্ভ হয়েছে আরও এক পাহাড়। মাঝখানের জায়গাটিতে একটি গ্রাম—সাংখোলা। কাঠ পাতা স্যাঁকোয় জলস্রোত পার হয়ে সাংখোলা গ্রামে প্রবেশ করলাম। রাস্তার দুপাশে দু-তিনটি দোকান ও বাড়ী-ঘর। একটি দোকানে কয়েকজন যাত্রীকে বসে থাকতে দেখে ঢুকে পড়লাম। বেঞ্চের উপর রঙিন কার্পেট পাতা। ভেড়ার লোমের তৈরী সুন্দর রঙিন কার্পেট এই অঞ্চলের লোকেরা নিজেরাই তৈরী করে এবং নানা জায়গায় চালান দেয়। দাম খুব সস্তা নয়। ফেরার পথে এরকম কার্পেটের আসন একটি কিনেছিলাম। দোকানটি শুধু চায়ের দোকান নয়, চাল, ডাল, নুন, তেল, জামা-কাপড় সবই পাওয়া যায়। দোকানটি আবার গ্রামের পোষ্ট অফিসও বটে, দোকানদারই পোষ্ট মাষ্টার। যাত্রীরা খাম পোষ্টকার্ড কিনতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। দরজার মাথার উপর কৈলাসের রঙিন প্রতিকৃতি টাঙানো আছে।

চা-পর্ব শেষ হবার পর আবার পথে নামি। কাঠের পুলে এক ছোট নদী পার হয়ে আবার চড়াই আরম্ভ হয়। বাঁদিকে পাহাড়, ডান দিকে ভুট্টা ও অন্যান্য ফসলের ক্ষেত। পিছন থেকে ঘোড়ায় চড়ে একটি পাহাড়ী লোক আমার পাশে এসে বলেন—"বাবুজি, ঘোড়ামে বৈঠকে চলো, পৈস্যা নেহি লাগেগা।" সবিনয়ে জানাই ঘোড়ার দরকার নেই হেঁটেই যাব। ভদ্রলোক এগিয়ে যান। মাথার উপর চড়া রোদ, কষ্ট খুবই কিন্তু ঠিক করেছি হেঁটেই যাব। ঘোড়া করার মত সঙ্গতি নেই একথাও ঠিক। সাংখোলা থেকে প্রায় দেড় মাইল উঠে গলাগড় গ্রামে প্রবেশ করলাম। উচ্চতা ৭২০০ ফুট। আজকের যাত্রা এখানেই শেষ। গ্রামের শেষে পথের বাঁদিকে পাথর সাজিয়ে একতলা সমান উঁচুতে P.W.D. Rest House, ডান দিকে হাজার ফুট খাদ একটি নদীতে গিয়ে মিশেছে। চারিদিক গাছপালায় সবুজ। শিরখা থেকে গলাগড় ১৫ কিমি।

বিকেল বেলা আবার মেডিকেল চেক্‌আপ। একটা কথা বলা হয়নি; আগের দিন শিরখাতে আমার ব্লাডপ্রেসার ১৮৫°তে

পেঁৗছেছিল। তাই দেখে ডাক্তার আমাকে ৪টি ট্যাবলেট খেতে দিয়ে ছিলেন। এই মেডিকেল ব্যাপারটি হচ্ছে, দিল্লীতে মেডিকেল পাশ করলেও হাঁটা শুরু হবার দিন থেকে চীনে প্রবেশ করার আগের দিন পর্যন্ত প্রত্যেকদিন বিকেলে প্রত্যেক যাত্রীর রক্তচাপ ও বুক পরীক্ষা বাধ্যতামূলক। কোন যাত্রীর রক্তচাপ নির্দিষ্ট মাত্রার বেশী হলে ডাক্তার সেই যাত্রীকে আর অগ্রসর হওয়ার অনুমতি নাও দিতে পারেন। এক্ষেত্রে ডাক্তারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। আগের দিন আমার রক্তচাপ বৃদ্ধি পাওয়াতে আমি নুন জাতীয় খাদ্য একেবারে বর্জন করেছি এবং প্রচুর জল খেতে শুরু করেছি। আজ দুরু দুরু বক্ষে ডাক্তারের সামনে হাজির হলাম। আজ রক্তচাপের পরিমাণ দেখা গেল ৯০°।১৪০°, যাক্ ডাক্তারও খুশী, আমারও ভাবনা কমল।

সন্ধ্যায় গলাগড় গ্রামের স্কুল কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের নিমন্ত্রণ করতে এলেন। রাত্রিতে স্থানীয় স্কুলে একটি নাটক হবে, সেই অনুষ্ঠান দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। স্কুল রেষ্ট হাউস থেকে এক কিলো-মিটার দূরে। কয়েকজন যাত্রী গেলেন কিন্তু আমি আর গেলাম না। মোমবাতির স্বল্প আলোকিত ঘরে দরজা বন্ধ করে সকলে গল্প গুজবে মেতে উঠলাম।

৬ই সেপ্টেম্বর সকাল ছয়টা নাগাদ গলাগড় থেকে যাত্রা শুরু হল। এক মাইল মৃদু চড়াই পার হয়ে জিপতি মিলিটারী ক্যাম্পে প্রবেশ করলাম। ক্যাম্প থেকে আধ মাইল প্রায় সমতল রাস্তা পার হয়ে এলো জিপতি গ্রাম। দুটি ঘর, একটি চায়ের দোকান। দোকান পার হয়ে একশ গজ গেলেই রাস্তা বাঁদিকে বেঁকে গেছে, আর ডানদিকে একটু নীচে ছবির মত সুন্দর একটি P.W.D. Rest House। দলে কম সংখ্যক যাত্রী থাকলে গলাগড়ের পরিবর্তে এখানে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করা হয়। এই স্থানটি এক পাহাড়ের শিখরদেশ। একটু এগিয়ে যে দৃশ্য চোখে পড়ল তা রীতিমত ভয়াবহ। ডানদিকে দু-আড়াই হাজার ফুট নীচে রুপোলী সরু সুতোর মত কালী নদীকে দেখা যাচ্ছে, যাকে শেষ দেখেছিলাম তাওয়াঘাটের সামনে। ভীষণ

উৎরাই পথ খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে নীচে নেমে কালী নদীর তীরে গিয়ে মিশেছে। এই জায়গাটির নাম আমি কোন বইয়ে পড়িনি কিন্তু ফেরার পথে স্থানীয় লোকের মুখে জেনেছিলাম এই স্থানের নাম বিন্ধ্যাকোটিপাস। খুব সাবধানে নামতে শুরু করলাম। সামনে পিছনে অনেক যাত্রী কিন্তু কাহারও মুখে কথা নেই। ডানদিকে তাকালে মাথা ঘুরে যাচ্ছে। দু-তিন হাত চওড়া পথের পাথরগুলি ভাঙ্গ বসান নেই, পা দিলেই নড়তে আরম্ভ করছে। এরই মাঝে নীচ থেকে ভেড়ার পাল উঠে আসে পাহাড়ে গা মিলিয়ে পথ ছেড়ে দিতে হয়। ডানদিকে দু-হাজার ফুট খাঁড়া খাদ। প্রায় দেড় ঘণ্টা এইভাবে নামার পর কালী নদীর তীরে দাঁড়ালাম। বাঁদিকে এক ছোট ঝরণা। ঝরণার পর একটি ছোট চায়ের দোকান। ঝরণার জলে তৃষ্ণা নিবারণ করে দোকানে গিয়ে বসলাম। সহযাত্রী সুমিত্রা, দিল্লীর শর্ম্মাজী ও আরও কয়েকজন নিজেদের মধ্যে হাসি ঠাট্টায় মশগুল। এই অঞ্চলের চায়ের দোকানগুলিতে শশার মত প্রকাণ্ড এক ধরনের ফল পাওয়া যায়, স্থানীয় ভাষায় বলে কাঁকড়ি। একজন যাত্রী সেই ফল কিনে কেটে বিতরণ করছেন, খেতে ভালই। তারপর চা-পান শেষ হল। এখানে প্রত্যেক দোকানে খুবই খুচরো পয়সার অভাব লক্ষ্য করেছি। এক কাপ চা খেয়ে এক টাকা দিলে বাকী ৫0 পয়সা পাওয়া কঠিন হ'য়ে পড়ে। বাকী পয়সার জন্য আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করাও সম্ভব হয় না কারণ সামনে পথ পড়ে রয়েছে। বাধ্য হয়ে সহযাত্রীদের সাহায্য নিতে হয়।

চায়ের দোকানের পর সামান্য চড়াই। ডানদিকে ৭।৮ হাত দূরে কালীনদী ভীষণ গর্জন করে ছুটে চলেছে। অপর তীরে নেপাল। এই সব পথে একা চলা নিরাপদ নয় বলে মুখার্জীদার পিছনে হাঁটতে থাকি। এরপরে যে পথ পেলাম তাতে চড়াই উৎরাই কিছু নেই কিন্তু খুবই বিপদ সংকুল। পাহাড়ের গা ডিনামাইট দিয়ে ফাটিয়ে আড়াই ফুট চওড়া ও পাঁচ ফুট লম্বা অর্দ্ধগোলাকার পথ তৈরী করা হয়েছে; পথের ডান দিকে কোথাও তিন ফুট কোথাও চার ফুট নীচে

কালী নদী ভীষণ গর্জনে পাক্ খেতে খেতে ছুটে চলেছে। নদীর জলের ঝাপটায় পথ জল সিক্ত। খুব সাবধানে পা টিপে টিপে এগোতে থাকি। পথের এই অংশটিতে কত ঘোড়ার যে মৃত্যু হয়েছে তার ঠিক নেই। ঘোড়ার পায়ের নীচে লোহা বাঁধান থাকার ফলে পিছলে নদীর ঘূর্ণিতে পড়ে যায় এবং নিমেষে অদৃশ্য হয়ে যায়। ঘোড়াওয়ালারা পথের এই অংশটির জন্যে খুবই দুর্ভাবনায় থাকে। কোন কোন জায়গায় পথ করা সম্ভব হয়নি সেখানে কাঠ পেতে পথের সংযোগ রক্ষা করা হয়েছে, পাশে লোহার রেলিং। সিকি মাইল রাস্তা এরূপ বিপদ সংকুল। তারপর রাস্তা প্রায় সমতল, তবে বাঁদিকে পাহাড় থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ার ভয় আছে। রাস্তার ধারে লেখা দেখতে পাই "পাত্থর গিরনেকা ডর হ্যায়।" ঐরকম লেখা দেখলেই স্থানটি দ্রুত পার হবার চেষ্টা করি। এছাড়া সমগ্র কৈলাস পথটিতে কিছুদূর অন্তর "জয় কৈলাস পতিকী জয়" এবং নানা উপদেশ সুন্দর করে লেখা আছে।

কালী নদীর এই তীরে যেমন কৈলাস-যাত্রা পথ, নদীর অপরতীরে নেপাল সীমানায় পাহাড়ের গা বেয়ে বরাবর একটি পথ আছে। সেই পথে সারি বন্ধভাবে ভেড়ার পাল আসা-যাওয়া করছে দেখতে পাওয়া যায়। কিছু পথ পার হয়ে নেপাল সীমানায় একটি সুন্দর ঝর্ণা দেখতে পাওয়া গেল, 'নাম তামপাকু'। ঝর্ণার উপরে ঝোলা পুল নেপালের পথটির সংযোগ রেখেছে। ঢালু পথ বেয়ে মনের আনন্দে নেমে চলি। খানিক গিয়ে একটু উঠে পথ বাঁদিকে বেঁকে যায়। বাঁয়ে বেঁকে সামনে চোখে পড়ে বিখ্যাত নাজাং ঝর্ণা। দুটি পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে এসে একশ ফুট নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ে কালী নদীতে মিশেছে। কিন্তু বাঁদিকে পাহাড়টির চূড়া থেকে ধ্বসে গিয়ে ঝর্ণার উপর পড়ার ফলে নাজাং ফলসের পূর্বের সৌন্দর্য অনেক ম্লান হয়ে গিয়েছে। তাই ছবিতে দেখা নাজাং ফলসুয়ের সাথে বর্ত্তমানের নাজাং ফলসের কোন মিল নেই। ২০ ফুট লম্বা কাঠের পুল ঝর্ণার স্রোত পার হয়ে অপর তীরের পাহাড়ের সাথে পথের সংযোগ রক্ষা করেছে।

পুলো শেষ হবার পর থেকে আরম্ভ হয়েছে চড়াই। প্রথমে কিছুটা গাছের ছায়ায় ঢাকা পাথর বিছান পথ। তারপর কোন গাছের ছায়া নেই, পায়ের নীচে পাথরও নেই। আছে ঝুর ঝুরে মাটি আর বিকট চড়াই। অত্যন্ত সাবধানে একহাতে লাঠিতে চাপ দিই, অন্য হাতে পাহাড়ের গায়ে ঘাসের চাবড়া ধরি আর উঠি। এক এক সময় চার হাত পা দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে হয়েছে। একবার পা হড়কালে সোজা নাজাং ফলসের মধ্যে পড়তে হবে। রাস্তায় পাথর বসান থাকলে পিছলে যাবার ভয় থাকত না। এইভাবে এক মাইল উঠে বোলা পাশ ৮০০০ ফুট। শেষের দিকে রাস্তা কিছুটা ভাল। তারপর প্রায় সমতল রাস্তা। ডান দিকে বহু নীচে কালী নদী। তাকালে মাথা ঘোরে কিন্তু প্রকৃতি যে কি ভীষণ সুন্দর তা দেখার জন্য চোখ বারে বারে ফিরে যায়।

তারপর দেড় মাইল খাড়া উৎরাই। মাথার উপর চড়া রোদ, কষ্ট খুবই। মাথার টুপিটি আজ নেই, ঘোষদাকে দিতে হয়েছে। একটা গাছের ছায়ায় বসে বোতল থেকে জল ঢেলে তাতে একটু ইলেকট্রাল মিশিয়ে খেয়ে বসে রইলাম। সামনে এক মাইল দূরে নীচে নদীর ধারে সাদা দেওয়াল, সবুজ টিনের চাল মালপা রেষ্ট হাউস দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু শরীর আর বইছে না। কিছুক্ষণ বসার পর নদীর তীরে নেমে সামান্য উঠে মালপা রেষ্ট হাউসে প্রবেশ করলাম। বাঁদিকে পাহাড় আর ডানদিকে নদীর মাঝে একফালি সমতল জায়গায় তিনটি টিনের শেডের মধ্যে যাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। পেঁছানো মাত্র দু-গ্লাস সরবত। তারপর টিনের শেডের মধ্যে গ্রাউণ্ড শীটের উপর শুয়ে পড়লাম। কলের ব্যবস্থা থাকলেও স্নান করলাম না। দশ কিমি চড়া রোদে হাঁটার পর পাহাড়ী ঠাণ্ডা জলে স্নান করলে শরীর খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ফলে যাত্রাটাই মাটি। রান্নাঘর থেকে খাবার নিয়ে নদীর তীরে চলে গেলাম। যে সব যাত্রী এখন এসে পেঁছাননি, তাদের দু-এক জনকে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসতে দেখা গেল।

দুপুরে ঘুমানো আমার অভ্যেস নেই। তাই ঘোরাঘুরি করে সময় কাটাতে থাকি। রেস্ট হাউসের পিছনে অজস্র ডালিয়া ফুল লাল হয়ে আছে। মালপায় পাহাড়ের গায়ে কয়েকটি প্রাকৃতিক গুহা আছে—স্থানীয় ভাষায় অডিয়ার বা ওডার বলা হয়। অতীতে কৈলাস যাত্রীরা সেই সব গুহায় রাত্রি বাস করতেন। তখন মালপায় বাড়ী-ঘর কিছুই ছিল না। ১৯১৮ সালে শ্রদ্ধেয় প্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায় কৈলাস যাত্রাকালে একটি গুহায় রাত্রিবাস করে ছিলেন। তিনি লিখেছিলেন—গুহার ভিতর খাটের মত একটি পাথর আছে। মালপা ঢোকার মুখে পথের একটু উপরে আমি সেই গুহাটি দেখে এলাম।

বিকেলে মেডিকেল চেকআপ-এর পর কয়েকজন যাত্রী গ্রাম দেখতে বেরুলেন। গ্রাম বলতে চারটি ঘর, দুটি দোকান। আকাশে মেঘ জমতে শুরু করল কিছু পরে টিপ্‌টাপ্ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। এই হিমালয়ে দেখেছি প্রতি দিনই সন্ধ্যার দিকে মেঘ-বৃষ্টি আরম্ভ হয়; কিন্তু সকালে তার কিছু চিহ্ন থাকে না, আকাশ পরিষ্কার। সন্ধ্যায় একটি বড় ঘরে সমস্ত যাত্রীদের ডেকে স্বামিজী ও বাবাজী প্রার্থনা সভার আয়োজন করলেন। প্রার্থনা বলতে নারায়ণের স্তব। বাবাজী এক লাইন বলেন, যাত্রীরা সমস্বরে তার পুনরাবৃত্তি করেন।

রাত্রে খাওয়ার পর শোবার ঝামেলা কিছুই নেই, গ্রাউণ্ড শীট পাতাই আছে স্লিপিং ব্যাগ খুলে তার মধ্যে ঢুকে গেলেই হল। এক পাশে কালী নদীর গর্জন, উপরে টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

"বাবাজী চায়" ভোর সাড়ে চারটায় মালবাহক চা নিয়ে এসে ঘুম ভাঙায়। এই ঠাণ্ডায় ভোরবেলা বিছানা থেকে উঠতে খুবই বিরক্তি বোধহয়। কিন্তু উপায় নেই, সব কিছু রুটিন মাফিক ছক বাঁধা! একটু এদিক ওদিক হবার উপায় নেই। স্লিপিং ব্যাগের ভিতর শরীর অর্দ্ধেক ঢুকিয়ে পর পর দু-গ্লাস চা খেয়ে তবে ঠাণ্ডায় গা গরম হয়; তারপর উঠে স্লিপিং ব্যাগ অন্যান্য মালপত্র বাঁধাছাঁদা করে বাইরে

ঘোড়াওলাদের কাছে জমা দিয়ে তবে ছুটি। তারপর ব্রেকফাস্ট সাঙ্গ করে মানিকদারের নির্দেশের অপেক্ষায় থাকি।

মালপা থেকে সাড়ে পাঁচটায় যাত্রা শুরু হল। আজকের যাত্রা বুদি পর্যন্ত। রেস্ট হাউস থেকে একটু নেমে গেলেই ডানদিকে নদীর ধারে একটি হ্যেলিপ্যাড। একটুখানি সবুজ মাঠের মধ্যে সাদা পাথর দিয়ে H লেখা আছে। তারপর নদীর তীর ধরে আঁকা-বাঁকা পথ, চড়াই উৎরাই বেশী নেই। পথের দুপাশে এক ধরনের ছোট কালচে পাতার কাঁটা ঝোপ ও বিছুটি গাছের জঙ্গল দেখতে পাওয়া যায়। সিদ্ধি গাছের জঙ্গল ও প্রচুর দেখতে পাওয়া গেল। তিন ফুট লম্বা গাছ, পেঁপে পাতার মত ছোট ছোট পাতা। একজন মালবাহক বলল, এই সিদ্ধি গাছ থেকে চরস তৈরী হয়। কেমন করে তৈরী হয় তাও হাতে-কলমে খানিকটা দেখিয়ে দিল। ভাবলাম ফেরার পথে কিছু সিদ্ধি পাতা বাড়ী নিয়ে যাব পুজোর কাজে লাগবে। কিন্তু ফেরার সময় ঘরে ফেরার টান এত প্রবল ছিল যে সিদ্ধি গাছের কথা আর খেয়ালই হয় নি। এছাড়া এই পথের পাশে পাশে সাদা বুনো গোলাপ ফুলের গাছ প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়। খুব ছোট ছোট ফুল। দুই কিমি এই রকম পথে চলার পর এমন একটি স্থানে পেঁছিলাম যেটি খুবই বিপদ সংকুল। ডান দিকে উত্তাল কালী নদী আর বাঁদিকে চারশ ফুট উঁচু একটি কালো খাড়া পাহাড়। সেই পাহাড়ের মাথার উপর থেকে মুষলধারে বৃষ্টির মত জলের ধারা নীচে রাস্তার উপর পড়ছে। রাস্তায় বসানো পাথর খুবই পিছল ও মাঝে মাঝে শেওলা ধরা। এই জায়গাটার কথা বইয়ে পড়া ছিল তাই মালপা থেকে প্লাসটিকের ওয়াটার প্রুপটি সাইড ব্যাগে ভরে নিয়ে-ছিলাম। সেটি বের করে ঢাকাঢুকি দিয়ে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে করে পথে নেমে পড়লাম। পাহাড়ের গা ঘেঁষে খুব সাবধানে পায়ের দিকে নজর রেখে ৩০ ফুট এরকম পথ পার হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। যদিও মাথা জামা কিছু ভিজে গেছে তবু পায়ের দিক থেকে নজর সরাই নি। মাথা ভিজলে রক্ষা আছে কিন্তু পিছলে নদীতে

পড়লে রক্ষা নেই। মাথা উঁচু করে দেখতে লাগলাম এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য, প্রকৃতির এক অভাবনীয় লীলা। কিছু দূরে যাবার পর আর একটি ঝর্ণা ধারা সিক্ত পথ পেলাম তবে তেমন কিছু মারাত্মক নয়। পাহাড়ের কিনারা বেয়ে রাস্তার উপর বড় বড় ফোঁটায় জল পড়ছে, এই যা। এরপর একটি গ্রাম পেলাম নাম—লামেরি। দুটি দোকান, দু-তিনটি ঘর। রাস্তার বাঁ দিকে জলের কল। কুমায়ুনের এই অঞ্চলের প্রত্যেকটি গ্রামে জল সরবরাহ ব্যবস্থা অতি সুন্দর। এক গ্লাস চা খেয়ে পথের ক্লান্তি দূর করলাম। এই গ্রামটি মালপা ও বুদির ঠিক মাঝখানে অবস্থিত, এখান থেকে বুদি চার কিমি বাঙ্গালোরের ডাঃ সুমিত্রা যাত্রী হলেও একজন মালবাহক তাঁর বুক দেখার যন্ত্র ও ওষুধের থলি সঙ্গে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এখন ডাক্তার এসেছে জানতে পেরে গ্রামের কয়েকজন পাহাড়ী মহিলা সুমিত্রাকে ঘিরে ধরেন। তাঁদের রোগ-অসুখের কথা জানাতে থাকেন। ডাঃ সুমিত্রাও প্রত্যেককে পরীক্ষা করে ওষুধপত্র দিতে থাকে। দেখে ভাল লাগে। স্বামিজী সুমিত্রাকে একান্তে ডেকে বেশী ওষুধ খরচা করতে নিষেধ করেন—কারণ তিব্বতে ওষুধ পত্র কিছুই পাওয়া যাবে না। ৩৮ জন যাত্রী চলেছে, তাদের জন্য রাখা দরকার। কার কখন কি প্রয়োজন হয় কি বলতে পারে?

লামেরি ছাড়িয়ে আড়াই কিলোমিটার সামান্য চড়াই। ডানদিকে কালী নদী ও বাঁ দিকে পাহাড় আমাদের সঙ্গেই চলেছে। তারপর এক কিমি সামান্য উৎরাই। উৎরাই শেষে বাঁ দিকের পাহাড় শেষ হয়। বাঁদিক থেকে একটি জলস্রোতে এসে কালী নদীতে মিশেছে। একটি কাঠের পুলে সেই জলস্রোত পার হই। পাশেই একটি লোহার পুল তৈরী হচ্ছে দেখতে পাই। পুল পার হয়ে ধাপে ধাপে আধ কিমি উঠে বুদি। পথের ডান দিকে একটু নীচে সুন্দর P. W. D. Rest House। ভাল ঘরগুলি দক্ষিণ ভারতীয় ও মহারাষ্ট্রের যাত্রীরা আগেই এসে দখল করেছেন। বাঁদিকে একটি টিনের ঘর আছে তার মধ্যে নিজের স্থান করে নিতে হয়। পাশে

শেঠজী ও ডাঃ শুক্লা। ঘরের এক পাশে ট্রেনের থ্রিটায়ার বার্থের মত করা আছে, মেঝেতে ঠাণ্ডা লাগার জন্য নীচের বার্থে উঠে যাই।

এ পথে যতগুলি P. W. D. Rest House আছে, তার মধ্যে বুদি রেষ্ট হাউসটি সবচেয়ে সুন্দর। চারিদিকে গগন পর্শী সবুজ পাহাড়, মাঝখানে এই রেষ্ট হাউস। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার জন্য মাঝখানে একটি গোলাকার সিমেণ্ট বাঁধানো উঁচু জায়গা আছে তার দুপাশে ঘর। গোটা জায়গাটি অজস্র ডালিয়া জিনিয়া আরও কত না জানা ফুলে রঙিন হয়ে আছে।

বিকালে মেডিকেল চেক্‌আপের পর দেখতে পাই অনেক গ্রামবাসী চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের কাছে ভীড় করেছে। আজ এখানে ডাক্তার আসবে খবর পেয়ে দূরের গ্রাম থেকেও অনেকে ছোট ছেলে কোলে নিয়ে দেখাতে এসেছে। সঙ্গে এনেছে ডাক্তারের জন্যে নানা উপহার। কেউ এসেছে দুটো আপেল, কেউ অন্য ফলমূল। দেখে মনে হল এই অঞ্চলে চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা একেবারেই কম।

সন্ধ্যার কিছু আগে বুদি গ্রামের প্রধান আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ঘরে আসা মাত্র আমি তাঁকে খ্যাতির করে বসালাম। বৃদ্ধ হলেও মুখের চামড়া এখনও টান টান। তামাটে রং। নমস্কার বিনিময়ের পর জিজ্ঞাসা করলাম "আপনি কখনও তিব্বতে গেছেন?" প্রধান জবাব দিলেন "অনেক বারই গেছি। জিজ্ঞাসা করলাম— গার্বিয়াং গ্রামের কিচ্‌খাম্পা ও রঞ্জনকে আপনি চিনতেন? উনি উত্তর দিলেন—হ্যা চিনতাম, কিন্তু তারা আর নেই।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখি কিচ্‌খাম্পা ও রঞ্জন অতীত কৈলাস যাত্রীদের গাইডের কাজ করত। ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত যাঁরাই কৈলাসে গেছেন, তাদের প্রত্যেক দলকেই কিচ্‌খাম্পা, রুকুম সিং অথবা রঞ্জনদের কাউকে গাইড হিসেবে নিতে হয়েছে।

স্থান সংকুলানের অসুবিধার জন্য আজ আর সন্ধ্যায় প্রার্থনা সভার আয়োজন করা সম্ভব হয় না। তার বদলে ভট্‌চাযদার শ্যামা সঙ্গীত শোনা হয়, ভট্‌চাযদার গলাটি ভাল। ঘোষদা একটি ছোট টেপ-

রেকর্ডার ও কিছু ভজন গানের ক্যাসেট সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন তাও শোনা হয়। এক সময় মানিন্দার সিং ঘরে প্রবেশ করেন এবং দলনেতাচিত কণ্ঠে বলেন—অ্যাটেশন্ প্লীজ, টুমরোজ প্রোগ্রাম অ্যাট ফোর এ. এম. বেডটি, ফোর থার্টি ব্রেকফাস্ট, অ্যাট ফাইব মুভ।

পরদিন ভোর পাঁচটার আগেই বেরিয়ে পড়ি, কারণ এদিন সবচেয়ে বেশী পথ হাঁটতে হবে ১৭ কিমি, গন্তব্যস্থল গুঞ্জি। বুদির পর এক কিলোমিটার পথ প্রায় সমতল। এই অঞ্চলে চাষ-বাস বেশ ভালই হয় দেখতে পাই। সমতল পথ যেখানে শেষ সেখানে চারটি পথের মিলন স্থল। তারপরই আরম্ভ হয়েছে এক বিকট চড়াই। একটি গাছ পালায় ঢাকা আকাশ চুম্বী পাহাড়, সেটির মাথায় উঠতে হবে। এই চড়াইকে "বুদির চড়াই" বলে। মনে সাহস এনে উঠতে থাকি। বুদি সাড়ে আট হাজার ফুট আর পাহাড়ের মাথাটি সাড়ে দশ হাজার ফুট। দু-মাইলে দু-হাজার ফুট উঠতে হবে। ভোর বেলায় ঠাণ্ডা আর হাওয়ায় উঠতে খুব একটা কষ্ট হয় না; তবে এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ উঠলে বুকে হাঁপ ধরে, তখন একটু বসে বিশ্রাম নিতে হয়। হিমালয়ের মজা এই চড়াইয়ে উঠতে খুব কষ্ট হলেও সামান্য বিশ্রাম নিলেই সুস্নিগ্ধ বাতাসে সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যায় যে পাহাড়ে উঠছি সেটি বাঁদিকে, ডানদিকে কিছু দূরে গগনস্পর্শী পাহাড়ের মাথা থেকে গ্লেসিয়ার নেমে আসছে দেখে মন একটু ভীত হয়। এক সময় কুয়াশায় চারিদিক থেকে গেল, দশ-বার হাত অবধি দেখতে পাওয়া যায়। তার মধ্যেই উঠতে থাকি। তবে কান খাড়া করে রাখতে হয়। উপর থেকে মিলিটারী ঘোড়া এসে গায়ের উপর না পড়ে। এক মাইল উঠে দশ মিনিট বিশ্রাম করে নিলাম। খুবই ক্লান্ত লাগার জন্য পাহাড়ে ওঠার একটা মতলব বের করলাম। বুদ্ধিটা অবশ্য আমরা নয়, পাহাড়ীরা এই রীতি অনুসরণ করে আমি বইয়ে পড়ে-ছিলাম। ব্যাপারটি এই রকম ঃ—দাঁড়িয়ে রইলাম, পিছন থেকে কোন যাত্রী ঘোড়ার চেপে আমার সামনে আসা মাত্র আমি ডান হাতে দিয়ে ঘোড়ার লেজটি চেপে ধরলাম, বাঁ হাতে লাঠি, ব্যাস্ আর কোন চিন্তা

নেই, ঘোড়াই আমাকে হড় হড় করে টেনে তুলতে লাগল। আমি শুধু পথের দিকে দৃষ্টি রেখে পা ফেলতে লাগলাম। খুব কম সময়ের মধ্যে বিনা পরিশ্রমে অনেকটা চড়াই উঠে গেলাম। বেশ কিছু চড়াই ওঠার পর ঘোড়ার লেজ ছেড়ে দিয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার আগের মত ওঠা। সহযাত্রীরা তো আমার কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক! এই ভাবে অনেক এগিয়ে যাওয়া যাত্রীকে পিছনে ফেলে অনেক আগেই পাহাড়ের চূড়ায় পেঁাছে পেলাম।

এই স্থানের নাম সিয়ালেক পাস। পাসটি সরু গলির মত, উপরে আচ্ছাদনের মত পাহাড়ের কার্নিশ বেরিয়ে আছে। ডানদিকে একটি ঘণ্টা বাঁধা নানা রং এর পতাকা শোভিত ছোট মন্দির। সামনে আধ মাইল শ্যামল প্রান্তর, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। শুনেছি জুলাই-আগস্ট মাসে এই প্রান্তর ফুলে ফুলে ঢাকা থাকে কিন্তু আজ ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে কোন ফুল দেখতে পাওয়া গেল না। ফুলগাছ, গুলি শুকিয়ে গেছে। শ্যামল প্রান্তরের মাঝে একটি পাথরের উপর বসে পড়লাম। সঙ্গে রতিরাম (মালবাহক) ও পুলিশের হাবিলদার। আমাদের পিছনে দু-শ গজ দূরে ৮/১০ ফুট উঁচু পাথরের বেদীর উপর একটি সাদা মন্দির এবং সামনে একটি গোল বোর্ডে লেখা 'সিন্ধু তট্‌সে উঁচাই ৩৩৫০ মিটার'। সাইড ব্যাগ থেকে কিছু বাদাম বের করে চিবিয়ে একটু জল খেয়ে আবার হাঁটা শুরু করলাম। দু মাইল তীব্র চড়াই ভাঙার পর এই শ্যামল প্রান্তরের মধ্যে হেঁটে যেতে মনে একপ্রকার অপূর্ব শান্তি ও তৃপ্তি বোধ হতে থাকে। স্নিগ্ধ বাতাস সমস্ত ক্লান্তি ভুলিয়ে দেয়। ডানদিকে নেপাল সীমানায় বরফে ঢাকা সুউচ্চ পাহাড়, অতি সুন্দর দৃশ্য।

শ্যামল প্রান্তর পার হবার পর পাইন গাছের জঙ্গলের মধ্যে দশ-বার ফুট চওড়া রাস্তা। এক কিমি চলার পর এক ফাঁকা জায়গায় এসে পড়লাম। কাঠের পুলে একটি ঝর্ণা পার হতে হলো। দেখি পথের পাশে বসে ভট্‌চাযদা ও ঢালিদা খেতে শুরু করেছেন। ক্ষিদেও পেয়েছে খুব। ভোর বেলায় বুদিতে ব্রেকফাস্ট প্যাকেট দেওয়া হয়েছিল

এখন সেটা বের করে দুটো আলুর পরটা ও আচার খেয়ে নিলাম। এগুতে গিয়ে একটা বাঁকের মুখে দাঁড়াতে হল কারণ—গরু ও ভেড়ার পাল রাস্তা জুড়ে আসছে। পশুগুলি গার্বিয়াং গ্রামের হবে মনে হয়। এবং এগিয়ে বাঁদিকে একটি মন্দির। এখান থেকে সামনে এক মাইল দূরে গার্বিয়াং গ্রাম দেখতে পাচ্ছি। রাস্তা মন্দিরের নীচ দিয়ে বাঁদিকে উৎরাই নেমে গেছে। রাস্তা পলিমাটির তৈরী, মাটি খুব ঝুর ঝুরে। ভীষণ উৎরাই এই পথটিতে শুকনোতেই নামা বেশ কষ্টকর, বৃষ্টি হলে নামা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। এক সময় গার্বিয়াং গ্রামে প্রবেশ করি। বাঁদিকে পাহাড়ের গায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘর বাড়ী, ডানদিকে এক কিমি ঢালু হয়ে নীচে কালী নদী। অপর তীরে নেপাল। নেপালের পাহাড় পাইন গাছে ঢাকা কিন্তু গার্বিয়াং-এ তেমন গাছপালা নেই। এখানে চাষবাসও খুব সামান্য হয়। গ্রামের প্রথমেই দুটি চায়ের দোকান, তারি একটিতে ঢুকে পড়ে রাজমা সেদ্ধ ও চা খেয়ে নিলাম। অতীতে যখন ভারতের সঙ্গে তিব্বতের ব্যবসা বাণিজ্য চলত তখন এই গার্বিয়াং বছরের ছয় মাস জমজমাট থাকিত? কৈলাস যাত্রীরা এখান থেকে ঘোড়া, কুলি ও অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ করিতেন। কিন্তু বর্তমানে গার্বিয়াং কেমন জনহীন মনে হয়; কেবল চায়ের দোকানের সামনে জনা পনের বাচ্চা কিশোর ও বয়স্কের ভীড় দেখতে পেলাম। সবাই যাত্রীদের দেখতে এসেছে। গ্রামের বাড়ীগুলিও অধিকাংশই ভাঙাচোরা। খোঁজ নিয়ে জানলাম অনেকেই ধারচুলার দিকে গিয়ে বসবাস করছে। কি নিয়েই বা এখানে থাকবে! এক বৃদ্ধকে প্রশ্ন করেছিলাম, "সব ঠিক হ্যায় তো? বৃদ্ধ অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন "কৈসে ঠিক রঁহে, বাবুজী? রাস্তা ক্যাঁহা হ্যায়, কব বনেগী রাস্তা?" সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলাম "ধীরে ধীরে সব ঠিক হো যায়গা।" মুখে বলেছিলাম বটে কিন্তু মনে এও জানতাম গার্বিয়াং পর্যন্ত রাস্তা সুদূর ভবিষ্যতেও তৈরী করা সম্ভব হবে না। কারণ গ্রামটি আস্তে আস্তে নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

গার্বিয়াং ছাড়িয়ে আবার পলিমাটির উৎরাই রাস্তা। ডানদিকে নদীর ধারে চার-পাঁচটি করোগেট টিনের ঘর, মনে হয় ডাকবাংলো ছিল কিন্তু বরফপাতের ফলে দুমড়ে-মুষড়ে গেছে। গার্বিয়াং জায়গাটা দশ হাজার ফুটের বেশী উঁচু হলেও অসহ্য গরম লাগছিল। কিছু দূর এগিয়ে ডানদিকে কালীনদীর উপর একটি কাঠের পুল নেপালের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে। পুলের সামান্য পরেই নেপালের দিক থেকে একটি নদী বেরিয়ে এসে কালী নদীতে মিশেছে। নাম শুনিতিঙ্কর নদী। এর পর কালী নদীর সঙ্গে আমাদের পথও বাঁদিকে বেঁকে যায়। কিছুদূর গিয়ে দেখি আর রাস্তা নেই। তখন নদীবক্ষে নেমে পাথর ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে গিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে তীরে উঠে আবার পথ পেলাম। আরও কিছুটা গিয়ে সিকি মাইলের মত লম্বা ও বেশ চওড়া একটি ফাঁকা মাঠ। মাঠে তাঁবু ফেলার চিহ্ন রয়েছে। মাঠের আগে পর্যন্ত পথের পাশে ছোট বড় গাছ ছিল, এখন গাছ কমে গেছে। সামনে একটু চড়াই। মুখার্জীদা আমার পাশে হাঁটছিলেন। চড়াই ওঠার সময় এক জায়গায় বসে পড়লাম। রোদের তেজ আর সহ্য হয় না। তালপাতার টুপি সঙ্গে থাকলেও মাথায় দেওয়া সম্ভব নয় কারণ সামনের দিক থেকে ঝড়ের মত বাতাস আসছে। তিন চারশ ফুট উঁচু পাহাড়ী দেওয়ালের গায়ে আড়াই তিন ফুট পথ. নীচে নদী, সাবধান না হলে বাতাস আমাকেই নদীতে ফেলে দেবে টুপি তো কোন ছার! চোখে সর্ষেফুল দেখা কথাটা শোনা ছিল. আজ এখানে বসে তাই দেখতে লাগলাম। যেদিকে তাকাই কালো দেখছি—মাথা ঘুরছে। মুখার্জীদাকে বললাম, দাদা আমি বোধহয় গুঞ্জিতে পেঁছাতে পারব না। মুখার্জীদা ধমক দিয়ে বললেন "নিশ্চয় পারবি। অত তাড়াতাড়ির কি আছে? একটু বসে বিশ্রাম নে, শরীর সুস্থ হলে যাবি।" একটু ইলেকট্রাল মেশান জল খেয়ে দশ মিনিট বসার পর সত্যিই একটু ভালো বোধ হতে লাগল। আজ ছ'দিন পাহাড়ী পথে হাঁটছি কিন্তু এত কষ্ট কোন দিন পাইনি। ভোর পাঁচটায় বেরিয়েছি, এখন আড়াইটা। ক্ষুধা ও রোদের তেজের জন্য এরকম হচ্ছে বুঝতে

পারছি। এই সব উঁচু জায়গায় বাতাসে ধুলো-ধোয়া না থাকার ফলে রোদের তেজ দ্বিগুণ জোরে গায়ে লাগে। যাইহোক আবার দুজনে এগোতে লাগলাম। খানিক পরে মুখার্জীদা বলেন, "তুই এগিয়ে গিয়ে ক্যাম্পে আমার জায়গা রাখ, আমি আস্তে আস্তে যাচ্ছি।" বুঝলাম উনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। ষাট বছর বয়স, মনে উৎসাহ যতই থাক বয়সটাকে অস্বীকার করতে পারেন না। কিছুদূর গিয়ে দেখি গাইড পাণ্ডে পথের পাশে পাথরের উপর বসে আছেন। সমস্ত যাত্রীকে ক্যাম্পে না পেঁছে তাঁর ছুটি নেই। সব শেষে আসা যাত্রীদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। পাশে বসে পড়ে বললাম—"পাণ্ডে গুঞ্জি আর কত দূরে? আর তো পারছি না।" পাণ্ডে বলেন—"সামনেই, এসে গেছি।" সামনে তাকিয়ে দেখি কোথাও কিছু নেই। সামান্য পরে পিছনে তাকিয়ে দেখি গেরুয়া পোষাক পরে স্বামিজী আসছেন হেঁটে, স্বামিজীর ঘোড়ায় চেপে মুখার্জীদা এবং সব শেষে ঘোড়ার চালক। সবাই কাছে এলে আবার চলা শুরু করি। সামনে বহু দূরে দুটি পাহাড়ের মাঝে একটি খয়েরী রং-এর পাহাড়ের শিখর দেখা যায়। পাণ্ডে আঙুল বাড়িয়ে বলে,—"স্যার, ঐ হোল মিনি কৈলাস, ঐ কৈলাসের নীচেও একটি হ্রদ আছে।" হিমালয় সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা একেবারেই নেই—তাই শিখরটি ঠিক বুঝতে পারলাম না। কিছু দূরে পথের ধারে চ্যাটালো পাথরের উপর তিনজন লোক চড়া রোদের মধ্যে শুয়ে আছে। কাছে গিয়ে দেখি ভট্চাযদা, ঢালিদা এবং ওয়ারলেস টীমের সহকারী লোকটি। সহকারী লোকটি আবার প্রচুর মদ্যপান করেছে। গার্বিয়াং-এ ঘরে ঘরে মদ তৈরী হয়, সেখানেই হয়ত খেয়ে এসেছে। ভট্চাযদাকে বলি—"কি ব্যাপার দাদা। আপনারা তো আগেই এসেছেন, এখনও শুয়ে যে।" ভট্চাযদা বলেন, "তোমরা এগোও আমরা বিকেলে যাবখন।" স্বামিজীকে কথাটা জানাই, স্বামিজীর ধমক খেয়ে ভট্চাযদাকে উঠতে হয়। একটি দু-নদীর সঙ্গমে পেঁছাই। উত্তরদিক থেকে দুটি পাহাড়ের মধ্য দিয়ে আসছে কালী নদী, আর উত্তর পশ্চিম দিক থেকে আসছে কুটি নদী। অনেকে

বলেন কুটি গঙ্গা—জলধারা কালী অপেক্ষা অনেক বেশী। সঙ্গমের অপর তীরে পাহাড়ের গায়ে একটি সাদা রংয়ের মন্দির। স্বামিজী বলেন—"ঐ হ'ল ব্যাস মন্দির।" দূর থেকে দেশলাই বাক্সের মত মনে হয়। ঐ মন্দিরের নীচে একফালি সমতল জায়গায় ডানদিকে ভারত-তিব্বত সীমান্ত পুলিশের দপ্তর এবং বাঁদিকে কৈলাস যাত্রীদের বিশ্রাম গৃহ। চার-পাঁচটি টিনের সেড্ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু নদী পার হব কি করে? পাণ্ডে বলে—"এ জায়গায় একটি পুল ছিল কিন্তু গত বছর বরফপাতের ফলে ভেঙে গেছে।" "তাহলে উপায়?" "উপায়"—পাণ্ডে বলে, এখান থেকে এক কিমি গেলে গুঞ্জি গ্রাম, সেখানে পুল পার হয়ে এক কিমি পিছিয়ে এসে রেষ্ট হাউসে পৌঁছাতে হবে।" সর্বনাশ; হাত বাড়ালেই নদীর অপর তীরে রেষ্ট হাউস, সেখানে যাবার জন্য আরও দু' কিলোমিটার হাঁটতে হবে? খুবই মুষড়ে পড়লাম। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় প্রাণ-পাখি খাঁচা ছাড়া হবার জোগাড়। কিন্তু কিই বা করা যাবে? নিরুৎসাহ মনে ধীরে ধীরে হাঁটা শুরু করলাম। একটু উৎরাই-এ নেমে সর্টকার্ট করে গুঞ্জি গ্রামের গৃহস্থের উঠানের মধ্য দিয়ে চলতে থাকি। পাথরের ছোট ছোট ঘর, অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন। বাড়ীর লোকজন গম তোলার কাজে ব্যস্ত কেউ কেউ আমাদের দুর্দশা দেখে মুচকি হাসে। কোন দিকে না তাকিয়ে পুলের সামনে এসে দাঁড়াই। সেখানে দেখি আর এক দৃশ্য! আমাদের আগে যেসব যাত্রী এগিয়ে এসেছিলেন, তাদের অনেকেই কেউ পুলের উপর শুয়ে, কেউ বসে, কেউ রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। পুলের উপর নদীর ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, আমরাও বসে পড়লাম। বসে কিছু ছোলা ভাজা চিবানোর পর আবার উঠলাম। পুলের ৭০° খাড়া চড়াই, খুব ঝুরঝুরে মাটি। একবার পা ফস্‌কালে সোজা নদীর জলে।

কৈলাসপতিকে স্মরণ করে তীরে উঠে এলাম। গুঞ্জি গ্রামটি প্রধানত এই তীরে। মাঠের মধ্য দিয়ে হেঁটে রেষ্ট হাউসে প্রবেশ করলাম। ভোর পাঁচটায় যাত্রা শুরু করে বিকেল চারটায় যাত্রা শেষ

হল। ক্যাম্প ইনচার্জ এসে খাওয়ার জন্য তাড়া লাগান, চায়ের সময় ভাত খেতে হল।

বিকেলে ঘর থেকে বের হলাম কিন্তু প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস। সামনে আরও কয়টি টিনের ঘর দেখলাম। কিন্তু বরফপাতের ফলে ভেঙে গেছে। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা আশ্বিনের মাঝামাঝি ধারচুলার দিকে নেমে যায়। কারণ তখন প্রচুর বরফপাত শুরু হয়ে যায়। এই গুঞ্জি থেকে সূর্যাস্তের সময় নেপালের অন্নপূর্ণা শিখরটি এত সুন্দর দেখায় যে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আশে পাশে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলেও অন্নপূর্ণা শিখরটি অনেকক্ষণ কাঁচা সোনার মত জ্বলতে দেখা যায়।

চা খাওয়ার পর মেডিকেল চেক্‌আপ শুরু হল। ধারচুলা থেকে যে ডাক্তারটি আসছিলেন আজ তিনি নেই, তার বদলে ভারত তিব্বত সীমান্ত পুলিশের এক তরুণ ডাক্তার যাত্রীদের চিকিৎসার ভার নিয়েছেন। এখান থেকে তিনি লিপুলেক পাস পর্যন্ত যাবেন। এই অল্প বয়সী ডাক্তারটির সুন্দর ব্যবহার জীবনে ভোলা যাবে না। গুঞ্জি ও ধারচুলাতে যাত্রীদের এক বিশেষ ডাক্তারী পরীক্ষা দিতে হয়। সেটি হল যাত্রীকে কমপক্ষে এক মিনিট দম বন্ধ করে বসে থাকতে হয়।

সন্ধ্যায় প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হল। সমবেত প্রার্থনার পর বাবাজী কৈলাস ও রামেশ্বর নিয়ে আলোচনা করলেন। তারপর শুরু হয়ে গেল কৈলাস যাত্রায় রাজনীতির খেল্‌। দিল্লীতে আমাদের যে যাত্রার বিবরণী দেওয়া হয়েছিল তাতে লেখা ছিল—"আমরা যাত্রা সমাপন করে ২রা অক্টোবর দিল্লী ফিরব। কিন্তু এখন স্বামিজী প্রস্তাব করলেন যে তিনি চারদিন আগে সবাইকে নিয়ে দিল্লী ফিরতে চান। তাঁর দ্বিতীয় প্রস্তাব হল, তিনি অধিকাংশ যাত্রীকে কৈলাস-মানসসরোবর পরিক্রমা করতে নিষেধ করলেন। বারংবার যুক্তি দিয়ে বোঝাতে লাগলেন—পরিক্রমায় অত্যন্ত ঝুকি আছে। অতএব পরিক্রমা না করে বেস ক্যাম্পে বসে থাকাই সমীচিন।

৩৮ জন যাত্রীর মধ্যে ৮ জন দিল্লীর অধিবাসী, বাকীরা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের। দিল্লীর যাত্রীদের চারদিন আগে ফিরলে ক্ষতি নেই কিন্তু বাইরের যাত্রীরা সকলেই বাড়ী ফেরার জন্য অগ্রিম রেলের টিকিট কেটে যাত্রায় বেরিয়েছেন। আগে ফিরলে তাঁদের বাড়তি চারদিন হোটেলে থাকতে হবে, তাতে কম পক্ষে চারশ টাকা খরচ হবে, ঐ বাড়তি খরচা করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। স্বামিজীর দ্বিতীয় প্রস্তাবের উত্তরে বলা যায়—বহু অর্থ ব্যয়, অমানুষিক পরিশ্রম, বণ্ড সই, ডাক্তারী পরীক্ষা ইত্যাদি করে কৈলাস যাত্রায় বেরিয়ে কৈলাসে পৌঁছে পরিক্রমা করবেন না এটা চিন্তা করাই ভুল। কাজেই অধিকাংশ যাত্রী স্বামিজীর দুটি প্রস্তাবই মানতে অস্বীকার করলেন। ফলে হলো কি! মুহূর্তের মধ্যে সমগ্র দলটি দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। স্বামিজী, বাবাজী, মানিন্দার ও দিল্লীর যাত্রীদের নিয়ে একদল, দক্ষিণ ভারতীয় ও মহারাষ্ট্রের যাত্রীরা অন্য দলে। পুনের এক ভদ্রলোক তাঁদের নেতা। আগেই বলেছি দলে বাঙালী ছিলেন ৫ জন। বাঙালীরা একটু বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করে তাই সবাই চুপ করে জোট নিরপেক্ষ রইল। তবে আমি নিজে সকলের সঙ্গে আলোচনা করে জেনেছিলাম সবাই স্বামিজীর বিরুদ্ধে। ভট্চাযদা ঠোঁট কাটা মানুষ। তিনি প্রকাশ্যেই স্বামিজী-বাবাজীর বিরুদ্ধেই দু'চার কথা বলেছিলেন।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর দুই শিবিরে মৃদুস্বরে আলোচনা। ঠাণ্ডা আজ একটু বেশী মনে হচ্ছে। দশটা নাগাদ মোমবাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম।

৯ই সেপ্টেম্বর। কাউকে ডাকতে হয় না নিজেই উঠে পড়ি। এতদিনে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে ভোর চারটে বাজতেই ঘুম ভেঙে যায়। ঠাণ্ডা জলে আর মুখ হাত ধোওয়া যায় না। রান্নাঘরের বাইরে গরম জল ফুটছে সেখান থেকে সংগ্রহ করি। মালপত্র বাধাছাদা করে চারখানা গরম লুচি মটরের তরকারী ও দু'গ্লাস বোর্ণভিটা খেয়ে হাঁটা শুরু করলাম। আজকের গন্তব্য কালাপানি, এখান থেকে ১০ কিমি। রেষ্ট হাউস থেকে আধ মাইল ময়দান পার হয়ে কালী ও

দুটি নদীর সঙ্গমে এসে দাঁড়ালাম। বাঁদিকে উঁচুতে সাদা ব্যাস মন্দির। এখান থেকে পথ কালী নদীর তীর ধরে বাঁদিকে বেঁকে গেছে। পাহাড়ের গা বেয়ে পথ, চড়াই উৎরাই বেশী নেই। ডান দিকে কালী নদীর জল আর তত ঘোলাটে নয়, গর্জনও নেই কুল কুল করে বয়ে চলেছে। মাইল দুই পথ পার হয়ে এক জায়গায় অনেক ছোট বড় পাথর ছড়ানো—তার মধ্য দিয়ে পথ। একটি বড় পাথরে নীল রং দিয়ে লেখা রয়েছে, "৮৬ সালে জনৈক দক্ষিণ ভারতীয় যাত্রী ভয় পেয়ে এখান থেকে ফিরে গিয়েছিলেন, আপনি যেন ভয় পাবেন না।" লেখাটি পড়ে মনে বল আসে, দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে চলি। এরপর কিছুটা পাইন বনের মধ্য দিয়ে পথ। এক জায়গায় পাহাড়ের গায়ে পথ করা সম্ভব হয় নি, সেখানে একটি কাঠের উপর নদীর জলস্রোত পার হয়ে কালী নদীর বক্ষে নেমে ১০০ গজ ছোট-বড় পাথরের মধ্য দিয়ে হেঁটে আবার কাঠ পাতা সাঁকোয় নদী পেরিয়ে পাহাড়ের গায়ের রাস্তার উঠতে হয়। একটা জিনিস লক্ষ্য করছি যতই কালাপানির দিকে এগুচ্ছি ততই বাতাসের বেগ বাড়ছে। সঙ্গে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিও আরম্ভ হয়ে যায়। কালাপানির সামান্য আগে একটি কাঠের পুলে নদী পার হলাম। ডানদিকে এক পাহাড়ের নীচে দুই চূড়া বিশিষ্ট একটি গোলাপী রং এর মন্দির। মন্দিরের পাদদেশ থেকে একটি সরু জলধারা বেরিয়ে এসে নদীতে পড়েছে। এই জলধারাই কালী নদী। মন্দিরের নীচে কালী নদীর উৎস। মন্দিরের সামনে হাজির হই। কালী ও মহাদেবের মূর্ত্তি রয়েছে। মন্দিরের সামনে একটি গোলাকার কুণ্ডা। মন্দিরের নীচ থেকে জল এসে কুণ্ডে জমা হচ্ছে পরে জল ধারার আকারে নদীতে গিয়ে পড়ছে। কুণ্ডের নীচের পাথর কালো তাই জলও কালো মনে হয়। কালীর জলধারা যেখানে পড়ছে সেখান থেকে নদীর নাম কালী আর উপরের অংশটির নাম লিলিংতী নদী। ব্যাপারটা খুব মজার।

কালী মন্দিরের সামনে ফাঁকা মাঠে সারি দিয়ে ফোল্ডিং চেয়ার পাতা। কালাপানির সামরিক কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের অভ্যার্থনার জন্য এই

ব্যবস্থা করেছেন। সেখানে গিয়ে বসা মাত্র চা ও আলু পকোড়া হাজির হয়। ক্লান্ত শরীরে চা-পকোড়া অমৃত বলে মনে হয়। উঠে রেস্ট হাউসের দিকে এগুতে থাকি। মিলিটারী ক্যাম্পের গেট সুন্দর সাজানো। কয়েকজন অফিসার ও জোয়ান গেটে দাঁড়িয়ে যাত্রীদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। দেখে খুব ভাল লাগল। নিরাপত্তার কথা ভেবে সামরিক ক্যাম্পের বিবরণ না দেওয়াই ভাল। ক্যাম্প পার হয়ে একটি ফাঁকা মাঠে সাত-আটটি সাদা গোলাকার তাবু। এখানে টিনের সেড্ নেই, তবে পাশেই তৈরী হচ্ছে আগামী বছর চালু হয়ে যাবে।

ফাঁকা মাঠের ডানদিকে পাহাড়, বাঁদিকে নদী। কালাপানির চারিদিকে উঁচু পাহাড়ে ঘেরা। উত্তর দিকের পাহাড় গুলির বাদামী রং, গাছ পালার চিহ্ন মাত্র নেই। শিখরগুলিতে বরফের প্রলেপ এবং পেঁজা তুলোর মতো মেঘ জমাট বেঁধে আটকে আছে।

বেলা একটার সময় কালাপানিতে পেঁছেছিলাম। ৩৩৭০ মিটার উঁচু কালাপানিতে দুটোর পর সূর্য ডুবে গেল, সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের বেগও বাড়তে লাগল। খাবার সময় দাঁড়িয়ে খেতে হয়, বাতাসের বেগে রুটি, পাঁপড় ভাজা সব উড়ে চলে যায়। রান্না ঘরের আড়ালে খাওয়া সারতে হয়। খাওয়া শেষে তাঁবুতে নিজের জায়গায় বসে চিন্তা করতে থাকি। কালাপানিতে দুপুরবেলা যদি এরকম ঠাণ্ডা বাতাস বয়, তাহলে তিব্বতে না জানি আরও কত বেশী বাতাস! তার আগে লিপুলেক পাস আছে, সেও শুনেছি বরফের সমুদ্র। গরম পোষাকের মধ্যে আমার সম্বল একটি গান্ধী আশ্রমের কোট, একটি সোয়েটার বাড়ী থেকে এনেছিলাম আর একটি দিল্লীতে ৫৫ টাকায় কিনেছি। ফুলহাতা গেঞ্জি একটি আছে তবে এখনও বের করিনি। যে সব সহযাত্রীরা আমার সঙ্গে চলেছেন, আমি মুখে না বললেও তাঁরা সকলেই বুঝতে পেরেছেন আমার সহায় সম্পদ কম। যেসব বাঙালী যাত্রী চলেছেন তাঁদের কয়েকজন প্রয়োজনের অতিরিক্ত মালপত্র ও গরম পোষাক সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং বাড়তি মালপত্র মাঝপথে একটি

ক্যাম্পে জমা রেখে গিয়েছিলেন। আমার অসুবিধা জেনেও কেউ কোনরূপ সাহায্য করতে আসেননি। আমিও আর ঐ নিয়ে কিছু বলিনি।

এই যে প্রচণ্ড বরফের ঠাণ্ডা বাতাসে, যতই গরম জামা পরা থাক না কেন কিছুতেই বুকের কাঁপুনি কমে না। এর সঙ্গে লড়াই করার জন্য চাই উইণ্ড-চিটার। চামড়া অথবা রেক্সিনে তৈরী হয়, ভিতরে ফোম অথবা পালক দেওয়া থাকে—জ্যাকেটের মত গড়ন। আমি ছাড়া প্রায় প্রত্যেকেই সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। বসে বসে চিন্তা করতে থাকি যা হবার হবে, মানুষের সবচেয়ে বড় ভয় হল মৃত্যু। প্রতিজ্ঞা করেছি পথ যত দুর্গম হোক, ঠাণ্ডা বাতাস হোক, বরফ হোক, মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত এগিয়ে যাব, থামব না। যাঁর কাছে যাচ্ছি তিনিই নিয়ে যাবেন।

হঠাৎ পিঠে একটা কিছু পড়ার জন্য সম্বিত ফিরে এল। তাকিয়ে দেখি পাণ্ডে আমাকে বলেছেন—"দাদা, আমার কাছে একটা বাড়তি উইণ্ড-চিটার আছে, এটা আপনি রাখুন পথে আপনার কাজে লাগবে।" এই বলে একটা উইন্ড-চিটার আমাকে দেন। হাতে নিয়ে দেখি ভিতরে পালক দেওয়া দামী উইণ্ড-চিটার, আমেরিকায় তৈরী। পাণ্ডেদা বলেন যে জিনিসটা তিনি তাঁর এক শিকারী বন্ধুর কাছ থেকে চেয়ে এনেছেন। তাঁর নিজের একটা আছে—তবু পথে যদি কারও প্রয়োজন হয় এই ভেবে নিয়ে এসেছেন। কথাটা শুনে আর না করতে পারি না, কৈলাসপতির কৃপা মনে করে জিনিসটা মাথায় করেনি। তাঁর কৃপায় কিছুই অভাব থাকছে না—যা দরকার সঙ্গে সঙ্গে এসে যাচ্ছে। উইন্ড-চিটারটা পরে দেখি গায়ে ভালই হয়েছে। চেন টেনে বন্ধ করার কিছুক্ষণ পরেই শরীর গরম হয়ে গেল।

কিছু পরে যাত্রীদের কাছে যত ভারতীয় মুদ্রা ছিল সেগুলি সংগ্রহ করে ক্যাম্প ইন-চার্জের কাছে জমা দেওয়া হল। কারণ এর পরে তিব্বতে ভারতীয় মুদ্রার কোন প্রয়োজন হবে না। আমাদের তাঁবুতে টাকাকড়ি আহুজা সংগ্রহ করছিলেন। তিনি কথা প্রসঙ্গে

আমাকে বলেন—"দাসবাবু আপনার যদি কিছু টাকার দরকার হয় তবে আমার কাছ থেকে নিতে পারেন। যখন সুবিধা হবে তখন ফেরৎ দেবেন আমার কোন অসুবিধা হবে না।" ধন্যবাদ জানিয়ে বলি—"আমার এখন টাকার প্রয়োজন নেই। আপনি তো সঙ্গেই আছেন, দরকার হলে নিশ্চয়ই জানাব।" এ সবই কৈলাসপতির কৃপা ছাড়া আর কি?

কিছু পরে কাসটম্ ফরম্ পূরণ ও মেডিকেল শেষ হল। রক্ত চাপ ১৩০° আছে শুনে নিশ্চিন্ত হলাম। সন্ধ্যা নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের শীতলতাও বাড়তে থাকে। ঠাণ্ডায় থাকা উচিত নয় ভেবে তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করি। কিছুটা দূরে ঘোড়া সহিসরা একটি তাঁবু খাটিয়েছে। উপরে ছাউনি আছে, চারিপাশ খোলা। তাঁবুর সামনে পাথরের উনুনে রান্না চাপিয়েছে। উনুনের চারিপাশে গোল হয়ে বসে গল্প গুজবে ও ধূমপান চলেছে। ওরা খোলা তাঁবুতে কিভাবে রাত কাটায় ভাবলে অবাক হতে হয়। পাহাড়ের মানুষ হয়ত অভ্যাস আছে।

সন্ধ্যায় তাঁবুর ভেতরে মোমবাতির বদলে ব্যাটারীর আলো জ্বলে। কারণ ঝড়ো বাতাস। পাণ্ডেদা আমার সাথে ভাঙা বাংলায় গল্প আরম্ভ করেন। উনি কলকাতার একটি ব্যাঙ্কে আট বছর কাজ করেছেন তাই কিছু বাংলা বলতে ও বুঝতে পারেন। গরম সুপ এসে যায়, সুপের সঙ্গে গল্প জমে ওঠে। ঘোষদা গল্পে মন না দিয়ে নিজের ব্যাগ গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এটি তার নিত্য দিনের কাজ। এই প্রতিদিন ব্যাগ গোছানোর মধ্যে একটা রহস্য লুকিয়ে ছিল, সেটা আমি তিব্বতে প্রবেশ করার পরের দিন জানতে পেরেছিলাম, সে কথা যথাস্থানে বলব। ক্রমে রাত্রি ৮টা বাজলে গাইড পাণ্ডে তাঁবুর পর্দা তুলে ধরে মুখ বাড়িয়ে বলে—"বাবুজী ভোজনে তৈয়ার।" বাইরে গিয়ে ঠাণ্ডা বাতাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে খেতে ইচ্ছা করে না কিন্তু হিমালয়ে রাত্রি উপবাস করে থাকলে পরের দিন শরীর দুর্বল হবে, হাঁটতে পারব না এই ভেবে খেতে যেতে হয়।

পরদিন ভোরে মালবাহক চা নিয়ে এসে ঘুম ভাঙায়। বাইরে তখনও অন্ধকার কিন্তু বাতাস একেবারেই নেই। এই সব জায়গায় বেলা ১০টার পর ঝড়ো বাতাস আরম্ভ হয়। বরফের মত ঠাণ্ডা ঝর্ণার জলে মুখ হাত ধুয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে লাঠিহাতে ব্যাগ কাঁধে হাঁটা শুরু করি। ক্যাম্পের পর নদী তীরের উৎরাই পথে নদীর পুলের সামনে পেঁছাই। কাঠের পুলে নদী পার হবার পর আরম্ভ হয়েছে চড়াই। এই চড়াই দু-তিন কিলোমিটার পর্যন্ত চলে। এখানে কোন বড় গাছের দেখা মেলে না! পথের পাশেও কাছে-দূরের পাহাড়ের গায়ে চক্‌চকে ছোট বড় ঝোপ দেখতে পাওয়া যায়। একটা ভারি মজার জিনিস দেখতে পাওয়া যায়—একটি ঝোপ হয়ত টক্‌টকে লাল, পাশের ঝোপটি পুরো হলদে, তার পাশের ঝোপটি গাঢ় সবুজ। একই গাছের ঝোপ কিন্তু বিচিত্র বর্ণের বাহার। মনে হয় যেন গোটা পাহাড় জুড়ে রঙিন কার্পেট পাতা আছে। এ জিনিস চোখে না দেখলে বলে বোঝান যায় না। ফেরার সময় এই জায়গায় আমি ২০-৩০টি অর্কিড জাতীয় গাছ দেখেছিলাম। একই গাছ প্রত্যেকটির রং আলাদা। গাছগুলির একটি রঙিন ছবি তুলে এনেছিলাম।

চড়াই শেষ হবার পর কিছুটা আঁকাবাঁকা উৎরাই। তারপর দু-মাইল ব্যাপী একটি সমতল ফাঁকা জায়গা। সমস্ত জায়গাটি অজস্র ছাই রং-এর ছোট বড় নুড়ি পাথরে ভর্তি। গাছপালা দূরে থাক একগাছি ঘাসও চোখে পড়ে না। এ কোথায় এলাম? সমতল বাসীরা এই নুড়ি পাথরের সমুদ্রের কথা কল্পনাও করতে পারে না। এখন বাতাস আরম্ভ হয়েছে। সামনের দিক থেকে বাতাস এসে কানে চুলে ধাক্কা খেয়ে একটানা বাঁশীর মত আওয়াজ হচ্ছে। সেই শব্দ শুনতে শুনতে এগিয়ে চলি। এক মাইল পর বাঁদিকে একটি লম্বা নীচু পাহাড় প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে আছে। পথ সেই পাহাড়ের গায়ে গিয়ে ওঠে। আধ মাইল চলার পর পাহাড় শেষ হয়। আহুজা আমার আগে হাঁটছিলেন। পাহাড় শেষ হতেই তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, বাঁদিকে

তাকিয়ে বলেন—"আ গিয়া নাবিডাং।" তাড়াতাড়ি গিয়ে বাঁদিকে তাকিয়ে দেখি, সামনেই চারশো গজের মত একটি ঢালু প্রান্তর। সমগ্র প্রান্তরটি সবুজ ঘাসে ঢাকা। মাঠের প্রথমে ছোট পাথরের রান্নাঘর, তারপরে ৭।৮টি সাদা গোলাকার তাঁবু। এই জায়গার নাম নাবিডাং। কালাপানি থেকে নয় কিমি। শুনেছিলাম এই নাবিডাং নানা রংয়ের ফুলে ভরা থাকে। কিন্তু কোন ফুলই দেখতে পেলাম না।

কালাপানির পর থেকেই কৈলাস যাত্রা পথটি উত্তর থেকে পূর্ব দিকে বেঁকে গেছে। নাবিডাং-এ তাঁবুগুলি পূর্ব-পশ্চিমে খাটানো। মাঠ দক্ষিণে ঢালু হয়ে একটি হিমবাহে গিয়ে মিশেছে। তারপরই একটি পাহাড়ে এমন ভাবে বরফ পড়ে আছে যে, এখান থেকে পরিষ্কার একটি ওঁ লেখা আছে মনে হয়। ঐ পাহাড়টি ওঁ পর্বত নামে প্রসিদ্ধ! ওঁ লেখাটিও এক মাইল লম্বা চওড়া। পূর্বদিকে দুটি পাহাড়ের মধ্যে একটি সরু গিরিপথের মত রয়েছে; ঐ পথের পরেরদিন লিপুলেক পাসে যেতে হবে। লিপুলেক কথাটা মনে এলেই শরীরে শিহরণ জাগে। বইতে ঐ পাশের কথা বহুবার পড়েছি। কিন্তু বইয়ে পড়া আর বাস্তবে লিপু পার হওয়া এক কথা নয়। প্রত্যেক লেখকই লিপুপাসের দুর্গমতার কথা লিখেছেন। ভেবে লাভ নেই এত দূর যখন আসা গেছে, কৈলাসপতির দয়ায় লিপুলেক সহজেই পার হয়ে যাব।

দুপুরে খাওয়ার পর এদিক-ওদিকে ঘুরে বেড়াই। নাবিডাং এমনিতে জনহীন হয়ে থাকে, আজ কিন্তু গমগম করছে। আমরা ৩৮ জন ছাত্রী, গোটা ২৫।৩০ ঘোড়া ও তাদের চালক, ১৫ জন মাল বাহক, জনা ১৫ মিলিটারী জোয়ান, এছাড়া মেডিকেল টিমের ও ওয়্যারলেস টিমের লোকজন। এর উপর আছে কুমায়ুন নিগমের ক্যাম্প ইন-চার্জ ও রান্না করার লোকজন। মোট কথা এটি তীর্থযাত্রা না রাজকীয় কোন যাত্রা বোঝা মুশকিল।

বেলা দুটোর পর সূর্য ডুবে যায় তখনই আকাশে মেঘ ঘনিয়ে আসে। শীতল বাতাসের জন্যে বাইরে আর থাকা যায় না। তাঁবুতে

ঢুকে বত গরম জামাকাপড় পরে মাথায় বাঁদর টুপি ও হাতে উলের দস্তানা লাগানোর পর কাঁপুনি কিছু কম হয়।

বিকেলে মেডিকেল চেক্‌আপের জন্য ডাক পড়ে। বাইরে ঠাণ্ডা বাতাস। ডাক্তারকে অনুরোধ করি জামার উপর রক্তচাপ পরীক্ষা করতে কিন্তু ডাক্তার হাসিমুখে জানান তা সম্ভব না। অগত্যা সব জামা খুলতে হয়। আজকের রক্ত চাপের পরিমাণ ১৩৬°। গতকাল ছিল ১৩০°, ৬° বেড়ে যাওয়ায় মনে চিন্তা হয়। ডাক্তার অভয় দেন কোন চিন্তা নেই। উচ্চতার কারণে এরকম হয়েছে। নাবিডাং-এ কোন যাত্রীর রক্তচাপ ১৪০° ছাড়িয়ে গেলে তাকে লিপুলেক পাসে যেতে দেওয়া হয় না।

কিছু পরে মানিন্দার আমাদের তাঁবুতে ঢুকে সকলের পাশপোর্ট ও বিদেশী মুদ্রার পরীক্ষা করে চলে যান। বলা যায় না কেউ হয়ত রাস্তায় যে কোন একটি হারিয়ে ফেলেছেন, সেক্ষেত্রে তাকে এখানেই থেকে যেতে হবে।

তাঁবুর মধ্যে আমি ছাড়া মুখার্জীদা, ঘোষদা, পাণ্ডে সাহেব, ঢালিদা ও আমেদাবাদের কাডিকার—এই ক'জন আছি। মাঝে মাঝে ভট্‌চাযদা এসে গল্প করে যাচ্ছেন। সন্ধ্যার পরই টিপ্‌টিপ্‌ বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। মোমবাতির চারিধারে ঢাকাঢুকি দিয়ে গোল হয়ে বসে সকলে গল্প আরম্ভ করি। পাণ্ডেদার ইচ্ছা বাড়ী গিয়ে কৈলাস যাত্রা নিয়ে একটি বই লিখবেন, এখন তিনি প্রত্যেককে নিজের পরিচয় দিতে ও জীবনের কিছু কথা বলতে অনুরোধ করে। প্রথমেই বর্ষীয়ান ঘোষদা আরম্ভ করেন,—ছোট বয়স থেকেই তার ভ্রমণে নেশা। পৃথিবীর অনেক দেশ ঘুরেছেন। ৩৬ বছর আগে একবার অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ও বরফপাতের মধ্যে কিভাবে অমরনাথ দর্শন করতে গিয়েছিলেন সেই কাহিনী শোনান। সেবারে তুষারপাতের ফলে বহু যাত্রীর মৃত্যু হয়েছিল কিন্তু ঘোষদা অতীব দুঃখ কষ্ট ভোগ করে জীবিত অবস্থায় ঘরে ফিরেছিলেন। সকলের পরিচয় প্রদান শেষ হলে আমার পালা আসে। পরিচয় দেবার মত আমার কিছুই নেই—

তবুও বলতে হয়। পিছিয়ে পড়া বাঁকুড়া জেলায় একটি গ্রামের ক্ষুদ্র দোকানদার আমি। শৈশব থেকেই মানস সরোবরের প্রতি আগ্রহ। দীর্ঘ ছয় বছর চেষ্টার পর এই বছর সুযোগ পেয়েছি। এর পূর্বে কোন দিন হিমালয় দেখিনি। দোকান বন্ধ করে কৈলাসদর্শনে বেরিয়েছি শুনে সকলেই বিস্মিত হন।

রাত নেমে আসে। জোরে বৃষ্টির সাথে তুষার পাতও শুরু হয়ে যায়। টর্চ জেলে দেখতে পাওয়া যায় তাঁবুর বাইরে সবুজ ঘাসের উপর সাদা বরফ জমে গেছে। নাবিডাং-এর উচ্চতা ১৩,৪০০ ফুট, এখানে বৃষ্টি হলে তুষারপাত হওয়াই স্বাভাবিক। ভাবনা হয় এই ভাবে বৃষ্টি ও তুষারপাত চলতে থাকলে পরের দিন সকালে লিপুলেক পার হওয়া অসম্ভব হয়ে উঠবে। আজ সকালে মালবাহক রতিরামকে শুধিয়েছিলাম—"রতিরাম, লিপুলেক পাসে উঠতে কি খুব কষ্ট হবে?" উত্তরে রতিরাম বলেছিল, "বাবুজী আমরা পাহাড়ী লোক, আমাদের উঠতেই প্রচণ্ড কষ্ট হয়, একপা একপা করে উঠতে হয়।" ভাবি যা হবার তা হবে, চিন্তা করে লাভ নেই। মোমবাতির স্বল্প আলোকে দেখতে পাই—সহযাত্রীদের মুখগুলিও শুকিয়ে গেছে। মনে হয় সকলেই লিপুলেকের কথাই চিন্তা করছেন।

ভয় ভাবনার জন্য সে রাত্রে ভাল করে খাওয়া হয় না। সামান্য কিছু মুখে দি মাত্র। খাওয়া শেষে শুয়ে পড়ি কিন্তু ঘুম আসতে চায় না। পাশের তাঁবু থেকে ওয়্যারলেসের কর্কশ শব্দ ভেসে আসতে থাকে। বোধ করি আকাশের অবস্থার জন্য কণ্ট্রোল রুমের সাথে সর্বদা যোগাযোগ বেখে চলেছে।

"উঠে পড়, তিনটে বেজে গেছে!" মুখার্জীদা ধাক্কা মারতে ঘুম ভেঙে যায়। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসি। আগেরদিন আমাদের বলে দেওয়া হয়েছিল—রাত তিনটায় উঠতে হবে, চারটায় যাত্রা শুরু। মালপত্র বেঁধে বাইরে তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার কিন্তু বৃষ্টি বা বরফপাত কিছুই নেই। আকাশ পরিষ্কার তবে কুয়াশার মতো রয়েছে। দূরে রান্না ঘরে উনুনে আগুন জ্বলছে। অন্ধকারের

মধ্যে যাত্রী ও অন্যান্য লোকজনের ব্যস্ততা লক্ষ্য করা যায়। মালপত্র জড়ো করে ঘোড়ার পিঠে তোলা হচ্ছে। আজকে রাত থাকতে যাত্রা শুরু করার কারণটি এখানে একটু বলে নেওয়া দরকার। আজ আমাদের কৈলাস পথের দুর্গতম অংশটি পার হতে হবে—সেটি হচ্ছে লিপুলেক পাস, যার উচ্চতা ১৬,৭০০ ফুট। লিপুলেক পাস সাধারণতঃ সকাল ৯ টার আগেই পার হয়ে যেতে হয় কারণ ঐ সময়ের মধ্যে পাসের অবস্থা ভাল থাকে। সাড়ে ৯ টার পর পাসের উপর প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস বইতে শুরু করে। তাতে শুধু মানুষ নয় ঘোড়াও উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। এর উপর আছে তুষারপাতের ভয়। তুষারপাত শুরু হলে মানুষ, জীবজন্তু সব বরফে ঢাকা পড়তে পারে। তবে সাড়ে ৯ টার আগে সাধারণতঃ তুষারপাত হয় না। কারণ ঝোড়ো বাতাস বইলেই বাতাসের সঙ্গে মেঘ আসে এবং পাসের উপর মেঘ এলেই তুষারপাত শুরু হয়ে যায়। এই কারণেই আজ রাত থাকতে যাত্রা শুরু। যাতে ৯ টার আগেই ঐ ভয়ংকর স্থান পার হওয়া যায়।

মানিন্দার হাঁক ডাক করেই যাত্রীদের যাত্রা শুরু করতে বলেন। স্বামিজীও উপদেশ দিতে থাকেন। রান্নাঘরে গিয়ে এক গ্লাস গরম পায়েস খেয়ে, ব্রেকফাষ্ট প্যাকেট ব্যাগে পুরে যাত্রার জন্য তৈরী হই। কে কোথায় আছে অন্ধকারে ভাল দেখাও যায় না। সামরিক জোয়ানরা তৈরী হয়ে নির্দেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁরাই আজ বড় ভরসা।

এই শেষ রাতে ঠাণ্ডা খুব। সামনে বরফের রাজ্য। সেজন্য পোষাক যথেষ্ট পরতে হয়েছে। প্রথমে হাত কাটা মোটা গেঞ্জি, তারপর ফুলহাতা উলিকটের গেঞ্জি জামা, পরপর দুটি হাতাওয়ালা সোয়েটার, কোট, কোটের উপর উইণ্ড-চিটার। নীচে উলিকটের টাইট পাজামা, উলের প্যাণ্ট। পায়ে উলের ও নাইলনের মোজা, কেডস্ জুতো। মাথায় বাঁদর টুপি ও হাতে উলের দস্তানা। মাফলার আনিনি তার বদলে ছোট শাল গলায় জড়িয়ে নিয়েছি। এইভাবে বরফের সঙ্গে লড়াই করার জন্য তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। মানিন্দার

নির্দ্দেশ দেওয়ার পর হাঁটা শুরু করি। পূর্বে উল্লেখ করা দুটি পাহাড়ের মাঝে সরু গলির দিকে এগুতে থাকি। দূরে কে একজন দাঁড়িয়ে আছে মনে হয়। খুব কাছে গিয়ে চিনতে পারি অশোক কুমার। হয়ত একা এগুতে ভয় পাচ্ছেন। কাছে গেলে আবার হাঁটা শুরু করেন। এখন সাড়ে চারটা আবছা অন্ধকার। লাঠি ঠুকে ঠুকে এগিয়ে চলি। কিছু দূর গিয়ে পথ ধনুকের মত ডানদিকে বাঁক নিয়েছে। পথ ভুল হবার সম্ভাবনা নেই পাথর বসিয়ে চার-পাঁচ ফুট চওড়া রাস্তা করা আছে। এরপর ঢেউ খেলানো রাস্তা। ইতিমধ্যে দু-একজন যাত্রী ঘোড়ায় চড়ে বা হেঁটে আমাকে অতিক্রম করে যাচ্ছেন। কেউ পাশে এলেই বলছি "ওম নমঃ শিবায়।" তিনিও ঐ বলে উত্তর দিচ্ছেন। এরপর রাস্তা পাহাড়ের গা বেয়ে চড়াইয়ে উঠে গেছে। বাঁদিকে পাহাড় ডানদিকে খাদ। পথের বাঁদিকে পাথর বসিয়ে ড্রেনের মত করা আছে। সেই ড্রেন দিয়ে উপর থেকে বরফগলা জল কুলকুল করে নেমে আসছে। অনেক জায়গায় ড্রেন ছাপিয়ে জল রাস্তায়ও জমে যাচ্ছে। রাস্তার পাথরগুলি ছাই রংয়ের? ছোট বড় চক্‌চকে গোলাকার। একস্থানে ঐ রকম জমে থাকা জল পার হবার সময়— একটা পাথরে দাঁড়িয়ে বাঁ হাতে লাঠি দিয়ে ড্রেনের মধ্যে চাপ দিয়ে লাফিয়ে সামনের একটি পাথরে চাপতে যাব—হঠাৎ লাঠিটি মাঝখানে ভেঙে বাঁ পাশ চেপে ড্রেনের জলের মধ্যে পড়ে গেলাম। বাঁ হাত দস্তানা সমেত ভিজে গেছে কিন্তু মাথাটি বেঁচে গেছে। কোমরে খুব যন্ত্রণা, সারা শরীর থর থর করে কাঁপছে, নিজে উঠতে পারছি না। হঠাৎ কে যেন আমার কাঁধ ধরে একটানে দাঁড় করিয়ে দিল। চোখ খুলে দেখি একজন জোয়ান। মুখে কথা বেরোয় না। জোয়ানটি আমাকে ধরে খানিক পথ নিয়ে গেল। একটু বিশ্রাম করার পর শক্তি ফিরে পেলাম। তখন জোয়ানটি আমাকে বলে যে, পাথরের উপর বরফ জমে থাকার ফলেই আমি পিছলে পড়ে গেছি। বাঁদিকে পড়ে-ছিলাম তাই রক্ষা। ডানদিকে পড়লে যে কি হত তা ভাবলে গা শিউরে ওঠে। জোয়ানটির হাত ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলি।

আবার এক বিপত্তি শুরু হয়। দস্তানা সমেত বাঁ হাতটা জলে ডুবে গিয়েছিল, এখন বাঁ হাতের আঙুলগুলি জমতে শুরু করেছে। কি করা যায় দাঁড়িয়ে ভাবছি ; এমন সময় দিল্লীর শিবানী ঘোড়ায় চড়ে আমাকে অতিক্রম করে দাঁড়িয়ে পড়ে। মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করে, "ক্যা হুয়া ভাইয়া ?" আমি বলি "পানিমে গির গিয়া থা।" হাত জম রহা হ্যায়। শিবানী চোখের পলকে নিজের হাত থেকে চামড়ার গ্লাভ্‌স জোড়া খুলে ফেলে ঘোড়ার সইসকে দিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। বলে—"জলদি পেহেন লিজিয়ে।" আমি বলি তুম্‌ ক্যা করোগী ?" "শিবানী বলে, "মেরী পাস্‌ আউর একঠো হ্যায়।" বলে সে ঘোড়ার গলায় বাঁধা থলি থেকে একজোড়া গ্লাভস্‌ বের করে পরে নেয়, তারপর এগিয়ে যায়। সঙ্গের জোয়ানটি বলে—"অব চলিয়ে।" দু-জনে এগোতে থাকি।

সামনে একটি ঝর্ণা। রাস্তার উপর দিয়ে পার হয়েছে। দুটি পাথরের উপর কাঠ পাতা। তিনজন জোয়ান সেখানে দাঁড়িয়ে। আমি পড়ে গিয়েছিলাম শুনে আমাকে আর কাঠে পা দিতে দেয় না। ধরাধরি করে আমাকে ঝর্ণা পার করে দেয়।

নাবিডাং থেকে এতক্ষণ যতটা পথ আসা হল, তার সবটাই মৃদু চড়াই। এতদিন থেকে হেঁটে আসছি কিন্তু কোনদিন হাঁটুতে ব্যাথা বা নিঃশ্বাসের কষ্ট কোনটাই বোধ হয় নি। কিন্তু এখন হাঁটুতে ব্যাথা নেই তবে নিঃশ্বাস নিতে একটু কষ্ট হ'চ্ছে। সঙ্গের জোয়ানটির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা সম্ভব নয়। তাই তাকে এগিয়ে যেতে বলি। সামর্থ অনুযায়ী টুক্‌টুক করে এগিয়ে চলি।

পিছন থেকে স্বামিজী ও মানিন্দার আমার কাছে আসেন। স্বামিজীকে জিজ্ঞেস করি—"স্বামিজী, সংচাম জায়গাটা কোথায় ?" আমি বইতে পড়েছিলাম, অতীতে কৈলাস যাত্রীর লিপুলেক যাওয়ার পথে দুর্যোগে পড়লে সংচামে পাথরের ঘরে ঢুকে আশ্রয় নিতেন। বর্তমানে এ পথে কোন ঘর দেখতে পাইনি। স্বামিজী আমতা আমতা করে বলেন—এখানেই কোথাও হবে। স্বামিজী এর আগে

দু-চারবার কৈলাসে এসেছেন কিন্তু খোঁজ-খবর খুব একটা জানেন বলে মনে হয় না।

যাইহোক এখন চলার পথে যা দেখছি তাই বলি। একজন পিঠে অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে চলেছে। একটি ঘোড়ার পিঠে একবোঝা শুকনো কাঠ। এক পাহাড়ী যুবক চলেছে, তার কাঁধে একটা বেলচা, হাতে বোতল। এসব নিয়ে কি হবে পরে বুঝেছিলাম। রাস্তার ছোট ছোট সাদা ফুলের মতো দেখতে পাওয়া গেল। সন্দেহ হওয়ায় ঝুঁকে দেখলাম ফুল নয়। তৃণ জাতীয় শুকনো গাছে বরফ জমে আছে। ক্রমে রাস্তা ও রাস্তার পাশে চাপ চাপ বরফ দেখতে পাওয়া গেল। কিছু পরে সম্পূর্ণ বরফের রাজ্যে উপস্থিত হলাম। যেদিকে তাকাই শুধু সাদা বরফ, মাঝে মধ্যে দু-একটা কালো পাথর উঁচু হয়ে আছে। আগে যাওয়া ঘোড়া ও যাত্রীদের পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে এগিয়ে চলি। পথের পাশে গর্ত, খাস সব বরফ পড়ে ঢাকা। অসাবধাণতাবশতঃ গর্তে পড়লে বিপদ ঘটতে পারে তাই সাবধানে চলতে হয়।

কিন্তু শরীর আর বইছে না। অত্যন্ত ক্লান্তি অনুভব করছি। নাক দিয়ে জল পড়ে কিন্তু নাকের ডগায় এসে বরফ হয়ে জমে যাচ্ছে। চোখের পাতাতেও গুঁড়ি গুঁড়ি বরফ। নাকে দিয়ে আর নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। মুখ দিয়ে নিতে হচ্ছে ফলে গলা শুকিয়ে কাঠ। সামনে এখনও কতটা পথ কে জানে? দেখলে মনে হয় চারিদিকে রাশি রাশি সাদানুন ছড়ান আছে। দাঁড়িয়ে পড়ি। পিছন থেকে একজন জোয়ান উঠে আসেন, আমি তার হাত ধরি। জোয়ানটি আমাকে বগলদাবা করে হাঁটতে থাকেন। গলা শুকিয়ে কাঠ। সাইড ব্যাগে কাশির বড়ি কয়েকটা ছিল তারই একটা মুখে ফেলি। সঙ্গের জোয়ানটিকে এবং পিছন থেকে উঠে আসা রতিরামকে একটা করে দি। রতিরাম বলে এইসব জায়গায় হাঁটার সময়ে ভিটামিন সি ট্যাবলেট মুখে রাখলে কষ্ট অনেকটা কম হয়। তা হয়ত হয়, কিন্তু এখানে পাই কোথায়? দূরে বরফ ঢাকা পাহাড় শিখরগুলি সদ্য ওঠা সূর্যের

আলো পড়ে সোনার মত ঝক্‌ঝক্‌ করছে। ব্যাগ থেকে কালো চশমা বের করি। কিন্তু নিজে পরতে পারি না, হাত কাঁপছে, সঙ্গের জোয়ানটি পরিয়ে দেয়। হাতে দস্তানা থাকলেও হাতের আঙুলগুলি ঠাণ্ডায় অবশ, কোন কাজ করছে না। সঙ্গের জোয়ানটি দিব্যি খালি হাতে চলেছে। পিঠে অত্যাধুনিক ভারী আগ্নেয়াস্ত। এক হাতে আমাকে টেনে নিয়ে বরফের চড়াই ভাঙছে, সঙ্গে গুণ গুণ গানও গাইছে। কোন কষ্ট হচ্ছে বলে মনে হয় না। ওঁর খালি হাত দেখে শুধাই ঠাণ্ডা লাগছে কিনা? উত্তরে বলেন—বরফের মধ্যে বর্ডার পাহারা দিতে হয় তাই অভ্যাস হয়ে গেছে।

সামান্য গিয়ে রতিরাম বরফের উপর বসে পড়ে। পিঠে ভারী বোঝা, হয়ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আমরাও দাঁড়িয়ে পড়ি। সামনে তাকিয়ে দেখি ডলিদি বরফ ভেঙে চড়াইয়ে উঠছেন, পা অনেকখানি বরফে ডুবে গেছে, তুলতে পারছেন না, টলমল করছেন। সঙ্গের জোয়ানটিকে বলি—ওঁকে একটু সাহায্য করুন। জোয়ানটি এগিয়ে গিয়ে ডলিদি কে ধরে চড়াই-এ উঠতে থাকেন। আমিও রতিরামের হাত ধরে উঠতে শুরু করি। মুখ দিয়ে হাপরের মত নিঃশ্বাস নিতে হচ্ছে। কিছু উঠে একটু সমতল মত জায়গায় হাজির হলাম। বরফে ঢাকা জায়গাটির মাঝখানে বেলচা দিয়ে বরফ সরিয়ে শুকনো কাঠ ধরিয়ে আগুন জ্বালানো হয়েছে। আগে আসা যাত্রীরা সেখানে আগুন পোহাচ্চেন। আগুনে কোন উত্তাপ নেই। কাঠের যে অংশটি জ্বলছে সেখানে হাত দিলেও কোন তাপ লাগে না। এখান থেকে এক কিলোমিটার উপরে লিপুলেক পাস দেখতে পেলাম। উত্তর থেকে দক্ষিণে একটি পাহাড়ের প্রাচীর, তার মাঝে একটু ভাঙামত জায়গা—সেটি লিপুলেক পাস। আমাদের এখানে একটু অপেক্ষা করতে হবে কারণ পাসের উপর এখনও চীনা কর্তৃপক্ষ এসে পৌঁছাননি। নিয়ম হচ্ছে একই সময় ষষ্ঠ ব্যাচের যাত্রীরা ভারতে প্রবেশ করবেন এবং সপ্তম ব্যাচের যাত্রীরা তিব্বতে প্রবেশ করবেন।

রতিরামকে পাঁচ টাকা বক্‌শিস্‌ দি এবং অনুরোধ করি যেন

সঙ্গেই থাকে। রতিরাম অভয় দেয়—কোন চিন্তা নেই, কিন্তু তার আধমিনিট পরেই আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। উপরে লিপলেক পাসের উপর পুতুলের মত ছোট কয়েকটি মানুষ ও ঘোড়া দেখতে পাওয়া যায় এবং নির্দেশও এসে যায়। নির্দেশ আর কিছুই নয় একটি হলদে পতাকা উড়তে দেখা যায়। স্বামিজী সকলকে পাসের উপর উঠতে হুকুম করেন। সবাই প্রাণপন চেষ্টায় উঠতে শুরু করেন। শরীর এত ক্লান্ত যে এক পা হাঁটতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু উপায় নেই, এখানে বসে পড়া মানে জীবনের আশা ত্যাগ করা। একে খাড়া চড়াই তার উপর বরফ। চড়াইও বরফের জন্য কষ্ট হচ্ছে, তার চেয়ে বেশী কষ্ট হচ্ছে নিঃশ্বাসের জন্য। মুখ দিয়ে হাপরের মত নিঃশ্বাস নিয়েও বুকটা খালি থেকে যায় এবং ঐভাবে নিঃশ্বাস নেওয়ার ফলে শরীর অসম্ভব ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এই সব জায়গায় অক্সিজেন কম পরিমাণে থাকে। যাঁরা ঘোড়ায় চলেছেন তাঁদের নিঃশ্বাসের কষ্ট ততটা নেই তবে এক ভাবে বসে থাকার জন্য ঠাণ্ডায় হাতে পায়ে খিল ধরে যায় মনে হয়।

যাইহোক ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করে চার-পাঁচ হাত উঠি আর একটু বিশ্রাম করি। এই অবস্থা যে শুধু আমার একার তা নয়, কারও কারও অবস্থা আমার চেয়েও খারাপ। দাঁড়িয়ে থেকে নিঃশ্বাস নিয়ে প্রাণটা বাঁচিয় রাখাই কষ্টকর। চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে কৈলাসপতিকে স্মরণ করি। হঠাৎ রবীন্দ্র মেহেরা বলে এক যুবক পিছন থেকে উঠে আসে। মাদ্রাজে বাড়ী, ২৫।২৬ বয়স অত্যন্ত সুগঠিত চেহারা। আমার দিকে তাকিয়ে দেখে বোধহয় আমার অবস্থাটা বুঝতে পারে। হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে—"পাকড়াও মেরা হাত। অগর ম্যায় উপর পৌঁছুঙ্গা, তো তুভি পৌঁছে গা।" মেহেরা বজ্র কঠিন মুষ্টিতে আমার হাত ধরে চড়াইয়ে উঠতে থাকে। ভারত সরকার লিপুপাস পর্যন্ত আঁকাবাঁকা রাস্তা তৈরী করেছেন কিন্তু মেহেরা সেই রাস্তায় যায় না। তাড়াতাড়ি পাহাড়ের মাথায় পৌঁছবে বলে সোজাসুজি উঠতে থাকে। নিষেধ করতে যাই কিন্তু গলার কাছে দম বন্ধ হয়ে কথা

বেরোয় না। নেশা গ্রস্তের মত মেহেরা যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে সে দিকেই যাচ্ছি। চোখেও যে খুব একটা ভাল দেখছি তা মনে হয় না। সাদা বরফের উপর সূর্যের আলো পড়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে চোখে কালো চশমা থাকলেও চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। কতক্ষণ এভাবে চলেছিলাম বলতে পারছি না ; এক সময় মেহেরা আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে—পাসে এসে গেছি, হাত ছেড়ে দেব যেতে পারবি ? মুখে কথা বেরোয় না, ঘাড়টা হেলাই, মেহেরা আমাকে ছেড়ে এগিয়ে যায়। সামনে তাকিয়ে দেখি কুড়ি হাত দূরে লিপুলেক পাস। সেখানে স্বামিজী ও আরও কয়েকজন দাঁড়িয়ে। এই জায়গায় খুব সামান্য চড়াই, টলতে টলতে এগিয়ে চলি। ষষ্ঠ ব্যাচের যাত্রীরা একে একে ভারতে প্রবেশ করছেন—তাঁদের কেউ কেউ হাত তুলে নমস্কার করেন। উত্তরে নমস্কার করা তো দূরের কথা, মুখে নমস্কার কথাটা উচ্চারণ করতেও পারি না, এত ক্লান্ত। ধীরে ধীরে পাসের উপর গিয়ে দাঁড়াই। ডানদিকে একটু খাঁজ মত আছে, সেখানে একজন চীনা বসেছিল। তাকে ইশারা করতেই সে উপরে উঠে যায়। সেখানে বসে পড়ি। মাথা ঝুঁকে বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে থাকি। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে বহুক্ষণ, জলের বোতল উপুড় করে দেখি জল নেই, সকালে নিতে ভুলে গেছি। চার-পাঁচ ফোঁটা তলানি জল পড়ে ছিল তাই জিভে ঢালতে সামান্য সুস্থ হই। স্বামিজীকে বলি,—একটু জল খাব। স্বামিজী অত্যন্ত চটে যান, বলেন, এই বরফের মাঝে জল কোথায় পাওয়া যাবে ? কথাটা ঠিক। অধিকাংশ যাত্রী তখনও পাসের উপর উঠতে পারেন নি। উপর থেকে দেখছি তাদের মুখগুলি, কি অমানুষিক কষ্টই না হচ্ছে। স্বামিজী তিব্বতের দিকে নেমে যাবার জন্য ধমক লাগান কিন্তু ধমকে কান দিই না। এই সেই লিপুলেক পাস—যার কথা কত পড়েছি, কত ভেবেছি। এখন প্রাণভরে একটু দেখেনি। উত্তর-দক্ষিণ বরাবর লম্বা পাহাড়ের মাথায় চার-পাঁচ ফুট চওড়া করে পাথর কাটা, কোন মোটা মাটির প্রাচীর থেকে দরজাটা খুলে নিলে যেমন দেখতে লাগে, অনেকটা তেমন। পাসের মাথায় বরফ নেই,

আসে পাশে বরফ দেখা যায়। হল্‌দ ও লাল এক সাথে মেশালে যে রং হয়, আসেপাশের পাহাড়ের সেই রং। শ্‌নেছি গত সাত বছরের মধ্যে এই সেপ্টেম্বর মাসে লিপ্‌লেকে বরফ সব চেয়ে কম। গত জ্‌ন মাসেও এখানে তিন ফুট বরফ ছিল। এর কারণ হচ্ছে ৮৭ সালে ভারতের উত্তরাঞ্চলে অভূতপ্‌র্ব খরা। এই খরার প্রভাব ভারত পেরিয়ে তিব্বতেও পড়েছিল। লিপ্‌লেক পাসে তাপমাত্রা মাইনাস ২০° হলেও নাবিডাং থেকে হেঁটে আসার ফলে গরম বোধ হচ্ছিল। চারিদিকে আকাশ ছোঁয়া বরফমণ্ডিত শৃঙ্গ, উপরে গাঢ় নীল আকাশ, মেঘের চিহ্ন মাত্র নেই। সকালের ঝক্‌ঝকে স্‌র্যের আলো পড়ে শৃঙ্গগ্‌লি এক অবর্ণনীয় র্‌প ধারণ করেছে। লোভ হয় কালো চশমাটা সরিয়ে খালি চোখে একবার এই দৃশ্য দেখি! কিন্তু খালি চোখে দেখলে অন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা। চোখ নিয়েই আমার জীবিকা, তাই আরও চেষ্টা করি না। ১৬,৭০০ ফুট উঁচুতে দাঁড়িয়ে আছি ভাবতেও অবাক লাগে। কিন্তু বসে দেখারও উপায় নেই, আবার নিঃশ্বাসের কষ্ট আরম্ভ হয়ে যায়। কিছ্‌তেই দম নিতে পারছি না। ব্‌কের কাছে দম আটকে যাচ্ছে। মিলিটারী ডাক্তার আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ডাক্তারের দ্‌-কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলি—"ডাক্তারবাব্‌, আমাকে কিছ্‌ ওষ্‌ধ দিন, আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না।" ডাক্তার বলেন—"ওষ্‌ধের কোন প্রয়োজন নেই, আপনি সম্প্‌র্ণ স্‌স্থ আছেন, দয়া করে এখানে দাঁড়াবেন না, নীচে নেমে যান। এখানে অক্সিজেন খ্‌বই কম। ফেরার সময় আমি আপনাকে এখানেই রিসিভ করবো।" খেয়াল হয় সত্যিই এখানে বেশীক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়। তাই লাঠি হাতে তিব্বতের দিকে নামার জন্য পা বাড়াই। ঘড়িতে সময় সকাল পৌনে নটা।

লিপুলেক পাস পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে পার হতে হয়। তারপর পথ উত্তর দিকে খাড়া ৭০° উৎরাইয়ে নেমে গেছে। দেড়শো ফুট খাড়া উৎরাই পথটিতে বরফ ছাড়া আর যা আছে সেটাকে বরফের কাদা বলা চলে। নামা অত্যন্ত কঠিন। লাঠি সামনে জোরে পুঁতে, লাঠিতে ভর দিয়ে খুব সাবধানে নামতে থাকি। দু-পা নামি একটু দাঁড়াই। এর মাঝে পাহাড়ের বরফে গা মিশিয়ে পথ ছেড়ে দিতে হয় কারণ উপর থেকে যাত্রীদের মালপত্র ঘোড়ায় চাপিয়ে তিব্বতীরা হুড়মুড় করে নীচে নেমে আসছে। একবার পা পিছলে গেল, সড়াৎ করে দশ ফুট নেমে পাথরে আটকে গেলাম। না আটকালে কি হত বলতে পারি না। দেড়শো ফুট এইভাবে নেমে একটু ঢালু মত জায়গায় দাঁড়ালাম। গোটা জায়গাটি তিন ফুট পুরু বরফে ঢাকা। এখানে ৫০/৬০টি ঘোড়া ও ৫০/৬০টি চীনা ও তিব্বতী লোকজন দেখতে পেলাম। অধিকাংশের বয়স ৩০-এর নীচে। কয়েকজন চীনা তরুণীও রয়েছে। কিড়িং মিড়িং, জু, জাও প্রভৃতি শব্দে জায়গাটি মুখরিত, সে ভাষার এক বর্ণও বোঝা যায় না। কোন দিকে না তাকিয়ে একটি পাথরের উপর বসে পড়ি। শরীর এত ক্লান্ত যে শুয়ে পড়তে ইচ্ছা করে। সামনে ঘোষদা আসেন। তার কাছে জলের বোতল নিয়ে মুখে ঢালি। কিন্তু একি? এটা জল না বরফ? লাফিয়ে উঠে মুখ থেকে সবটা ফেলেদি। এক তিব্বতী একটি ঘোড়া এনে ইশারায় আমাকে চাপতে বলে। পিছন থেকে শিবানী এগিয়ে এসে বলে—ভাই যা, এই ঘোড়ায় আমি চাপি তুমি পরেরটায় এসো। ঘোড়ায় চেপে শিবানী এগিয়ে যায়। অপর এক তিব্বতী তরুণ একটি ঘোড়া নিয়ে আমার সামনে আসে। আমার নিজের চাপার ক্ষমতা নেই। তরুণটি আমাকে নিজেই ঘোড়ার পিঠে তুলে দেয়। জীবনে এই প্রথম ঘোড়ায় চাপলাম তাও শরীরের এই

অবস্থায়। কতক্ষণ চেপে থাকতে পারব তাই ভাবছি। স্বামিজী সামনে এসে বলেন,—সামনে পিছনে শক্ত করে ধরে থাকবে? কিন্তু ধরার শক্তি কই?

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, অনেকদিন আগে এক ভদ্রলোক কৈলাস যাত্রা করে ফিরে গিয়ে লিখেছিলেন যে, লিপ্‌লেক পাস উঠতে তিনি তেমন চড়াই বোধ করেননি। কি করে করেননি তা তিনিই জানেন। নাবিডাং ১৩,৪০০ ফুট আর লিপ্‌লেক ১৬,৭০০ ফুট। তিন মাইলে ৩৩০০ ফুট বরফ ভেঙে উঠতে হয়েছে। যিনি হেঁটে লিপ্‌লেক উঠেছেন তিনিই জানেন চড়াই কতটা। গত ৮১ সাল থেকে কৈলাস যাত্রাকালে বেশ কয়েকজন যাত্রীর জীবন হানি ঘটেছে, তার অধিকাংশ ঘটেছে এই লিপ্‌লেক পাসে।

কিছু পরে ঘোড়ার সহিস তিব্বতী তরুণটি লাগাম ধরে টেনে নিয়ে চলল। যথা সম্ভব ইশারা করে তরুণটিকে বোঝালাম যেন সঙ্গেই থাকে। দু-দিকে পাহাড়ের মাঝে উৎরাই পথে যাত্রীদের নিয়ে ঘোড়াগুলি সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে চলল। এখানে একটি জিনিস লক্ষ্য করার আছে—লিপ্‌লেক উঠবার সময় ভারতীয় সীমানায় আড়াই-তিন কিলোমিটার বরফ পেয়েছিলাম কিন্তু তিব্বতের দিকে লিপ্‌লেকের আধ কিলোমিটার পর আর বরফ নেই। রুক্ষ পাহাড়ের গা দেখা গেল। একটু বাদে সামনে যা দৃশ্য দেখলাম তাতে ভয়ে হাত পা ভিতরে সেঁধিয়ে যাওয়ার মত অবস্থা! বাঁদিকে একটি ভীষণ ঢালু পাহাড়, পাহাড়ের গা ছোট ছোট পাথরকুচিতে ভর্তি, সেই পাহাড়ের গা বেয়ে ঘোড়াগুলি চলেছে। পথ বলে কোন জিনিস নেই। ঘোড়া চলার ফলে আড়াই-তিন ইঞ্চি দাগ দেখা যাচ্ছে মাত্র ডানদিকে একশো ফুট খাদ। সামনের ঘোড়াটির পা লেগে পাহাড়ের কিছু অংশ ধ্বসে গিয়ে হুড়মুড় করে খাদে গড়িয়ে পড়ল; আমার ঘোড়াটি ধ্বসা জায়গাটির উপর পা রেখে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে স্থানটি পার হল। সত্যি বলতে কি এখানে এসে জীবনের আশা ভরসা একেবারে ত্যাগ করতে হল। এ পথে কোন বিপদ হলে ঈশ্বর ছাড়া

কেউ রক্ষা করার নেই। ঈশ্বরের কাছে নিজের প্রাণটি জমা রেখে বসে রইলাম। প্রায় এক কিমি এইরূপ বিপদ সংকুল। ডানদিকে একটি ছোট জলধারা বয়ে চলেছে। নাম হিস্তী নদী। একজন তিব্বতী সহিস ছুটে জল খেতে গেল। তিব্বতীদের জল খাওয়ার ধরণ বড় বিচিত্র। নদীর তীরে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে নদীর স্রোতে মুখ ডুবিয়ে জল খায়। এখন পথ কিছুটা ভাল। শরীর কিছু সুস্থ বোধ হয়। জীবনের আশা ভরষা যেন ক্রমে ক্রমে ফিরে আসে। সামনে তাকিয়ে দেখি দূরে লম্বা খয়েরী রংয়ের পাহাড়ের সারি। পাহাড়ের প্রায় সমতল মাথাগুলিতে বরফের প্রলেপ। তিব্বতের আকাশ এত গাঢ় নীল যে ঠিক বলে বোঝানো যায় না। গাঢ় নীল না বলে নীলচে বেগুনী বলাই বোধহয় ঠিক। শুধু আকাশ দেখেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেওয়া যায়। প্রায় তিন কিলোমিটার এই পথে ঘোড়ার পিঠে চলার পর দুই পাহাড়ের মাঝে একখানি প্রায় সমতল জায়গায় ঘোড়া থেকে নামতে হল। জায়গাটির বাঁদিকে পূর্ব বর্ণিত নদী এবং জায়গাটিতে খুব সামান্য ঘাসের চিহ্ন আছে। মাঠের মধ্যে একটি খোলা ট্রাক ও একটি বেজিং ২১২১ জীপ গাড়ি দাঁড়িয়ে। এখানে পেঁছানোর পরই একজন চীনা আমাকে এক কৌটো সিলকরা অরেঞ্জ স্কোয়াশ দিল। প্রত্যেককেই এই স্কোয়াশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এত বরফের মত ঠাণ্ডা যে খাওয়া মুশকিল। সমস্ত যাত্রী ও মালপত্র পেঁছানোর পর মালপত্র ট্রাকে তোলা হল এবং মালপত্রের উপর যাত্রীদের গাদাগাদি করে বসতে হল। কয়েকজন জীপে গেলেন। এখানে সাড়ে চার ফুট লম্বা গোলগাল চেহারার ফরসা এক চীনা যুবক যাত্রীদের দেখাশুনা করছিলেন। এই যুবকই তিব্বতে আমাদের চীনা গাইড, কথা বলল ভাঙা ইংরাজীতে। পরে নাম শুনেছিলাম ওয়াং-চু।

এরপর শুরু হল ট্রাক যাত্রা। সামনে মরুভূমির মত উঁচু-নীচু পাহাড়ী ভূমি তার মধ্য দিয়ে বহু কৌশল করে ট্রাক এগোতে থাকে। এক এক সময় এত হেলে পড়ে যে লোকজন গড়িয়ে পড়ে যাবার মত

অবস্থা। কাছাকাছি কোন বড় পাহাড় নেই তবে দূরে দেখতে পাওয়া যায়। দূরের পাহাড়গুলি বিচিত্র বর্ণের—কোনটি লাল, কোনটি হলদে, কোনটি গৈরিক আবার কোনটি খয়েরী। অবাক হয়ে দেখতে থাকি। এখনও বিশ্বাস হয় না যে তিব্বতে এসে গেছি। কত দিনের স্বপ্ন আজ সার্থক হল। ট্রাকের উপর আমার বাঁদিকে এক বয়স্ক তিব্বতী ও এক চীনা তরুণী বসেছিল। আমার কয়েকটি তিব্বতী শব্দ জানা ছিল, কতকটা ইশারায়, কতকটা সেই তিব্বতী শব্দগুলির সাহায্যে তিব্বতীদের সাথে গল্প জুড়ে দিলাম। লোকটি বলে—আপনি নিশ্চয়ই এর আগে তিন চার বার তিব্বতে এসেছেন। আমি বলি, এই প্রথম বার। সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না।

একটি ছোট নদীর সামনে গিয়ে ট্রাক দাঁড়িয়ে পড়ে। নদীর অপর তীরে একটা ডিলাক্স বাস দাঁড়িয়ে। কাঠের উপর টিন পাতা সাঁকোয় নদী পার হয়ে বাসে উঠে বসি। একটা কথা বলে রাখা ভাল—তিব্বতে প্রবেশ করার পর থেকে কোনরূপ গাছের চিহ্ন মাত্র দেখতে পাইনি। প্রথমে জীপ, তারপর বাস, সবশেষে ট্রাক নদীর তীর ধরে প্রায় সমতল রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে ছুটে চলল। আজকের যাত্রা শেষ হবে তাকলাকোটে। লিপুলেক থেকে ২০ কিমি। ক্রমে বাস একটি তিব্বতী গ্রামের পাশ দিয়ে ছুটে চলে। গ্রামটির নাম সম্ভবতঃ পালা। ইঁটের পাঁজার মত সাদা রংয়ের তিব্বতীদের ঘর-বাড়ী, ঘরে খুব ছোট জানলা দরজা। প্রত্যেক বাড়ীর ছাদে দু-তিনটে সাদা পতাকা উড়তে দেখা যায়। তিব্বতীরা ভূত-প্রেতে খুব বিশ্বাস করে। ওদের ধারণা পতাকা থাকলে ভূত-প্রেত ধারে কাছে আসে না। গ্রামবাসীরা আশে পাশের ছোট ক্ষেতে গম তোলার কাজে ব্যস্ত। বেঁটে চেহারার তিব্বতী মেয়ে পুরুষ অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন, পরনে কালো আল-খাল্লা। পুরুষদের মাথায় মেয়েদের মত বিনুনী দেখতে পাওয়া যায়। ছোট ছেলে মেয়েরা হাত নেড়ে চিৎকার করে যাত্রীদের স্বাগত জানায়, বয়স্কদের চোখে মুখে আন্তরিকতার ছাপ তবে তারা নীরবেই থাকে। গ্রামের পিছনে তিনশো ফুট উঁচু মসৃণ দেওয়ালের মত একটি লাল

রংয়ের পাহাড়। পালা গ্রাম ছাড়িয়ে নদীর তীর ধরে বাস এগিয়ে চলে। কিছু দূরে যাওয়ার পর নদীর অপর তীরে আর একটি তিনশো ফুটের পাহাড় দেখতে পাই। পাহাড়টির নাম পুরাং। এই পাহাড়টির আঁকা ছবি আমি শ্রদ্ধেয় প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বইয়ে দেখেছিলাম। পাহাড়ের চূড়ায় অতীতে এই অঞ্চলের বৃহত্তম "শিম্পিলিং" গোম্ফাটি ছিল; এখন গোম্ফা নেই, তার ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। পুরাং পাহাড়ের নীচে সারি সারি অগুন্তি সাদা তাঁবু। অতীতে এখানেই বসত তাকলাখার মণ্ডি; এখন ভারতীয় ব্যবসায়ীদের আসা বন্ধ হলেও নেপালীরা উলের ব্যবসা করার জন্য এখানে আসে। এক কেজি উলের বিনিময়ে দু' কেজি চাল অথবা তিন কেজি আটা দেয়। টাকা কড়ির লেনদেন খুব একটা হয় না। তাকলাখার মণ্ডির সামনে খাড়া একশো ফুট নীচে নদী বয়ে চলেছে। এখানে নদী পারাপারের কোন ব্যবস্থা নেই।

বাস আরও দু-কিলোমিটার ডানদিকে গিয়ে ছোট লোহার পুলে ফর্ণালী নদী পার হয়। ফর্ণালীর তিব্বতী নাম মাপ ছু। নদী পার হয়ে সামান্য চড়াই রাস্তার দু-পাশে চার-পাঁচ ফুট উঁচু মাটির দেওয়াল। তার পিছনে সরুপাতার ইউক্যালিপ্টাস জাতীয় গাছ সারি করে লাগান হয়েছে। সামান্য পথ পার হয়ে বাস মস্ত সিমেন্টের গেটের ভিতর দিয়ে পুলান গেস্ট হাউসের মধ্যে ঢোকে। এই স্থানের নাম পুলান চৌপ, চীনারা কাটছাট করে পুলান করেছে। গেটের উপর চীনা, তিব্বতীও ইংরাজী ভাষায় পুলান গেস্ট হাউস কথাটি লেখা আছে। গেটের কিছুটা কাঁচা জায়গা তারপর একটি লম্বা হলঘর। চারিদিকে ফোল্ডিং চেয়ার পাতা হলঘরটিতে যাত্রীদের বসান হল। বসামাত্র প্রত্যেকের সামনে বড় চীনামাটির মগে আধ লিটার পরিমাণ 'র' কফি দেওয়া হল; কফিতে না আছে দুধ না আছে চিনি। এক চুমুক খেতেই বমি হওয়ার যোগাড়। ভোর চারটায় বেরিয়ে এখনও একটু জল খেতে পাইনি। কফি ছেড়ে জলের সন্ধানে বেরোলাম। দরজার পাশে ছোট ড্রামে সাদা ঘোলাটে জল রয়েছে, সেই জলই একটু খেলাম।

অত্যন্ত বিস্বাদ লাগে তবু প্রাণটা বাঁচে। বাইরে তখন চীনা শ্রমিকরা ট্রাক থেকে মালপত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে, জিনিসপত্র আস্ত থাকলে হয়।

এরপর কাস্টম ফরম্ পুরোন করার পর শুরু হল খানা তল্লাসী, তবে আমাকে ব্যাগ খুলতে হয়নি। ওয়াং চু বলে ; আপনার ব্যাগ খোলার দরকার নেই, আপনি পাশ। রেষ্ট হাউসের তিন নম্বর ঘরে স্থান পেলাম, সামান্য বারান্দা। বাঁদিকে একটি বড় ঘর, তার ভিতর একটি ছোট ঘর। প্রতি ঘরে গদিওলা খাট, লেপ, বালিশ, চেয়ার টেবিল, দেরাজ আছে। মস্ত পর্দা ঢাকা কাঁচের জানালা। এছাড়া প্রতিটি ঘর সুন্দর সাজান এবং ঠাণ্ডা-গরম জল ও বাসনপত্র আছে। বিজলী বাতিরও ব্যবস্থা আছে তবে আলোর সুইচগুলি বড় বিচিত্র। বড় ঘরে ঘোষদা, ঢালিদা ও ভট্চাযদা, ছোট ঘরে আমি ও মুখার্জীদা।

ঘরে মালপত্র গুছিয়ে রাখার পর অধীর হলাম ক্ষুধার জ্বালায়। ভোর চারটায় বেরিয়ে এখন তিনটে পর্যন্ত পেটে কিছু পড়ে নি। এখানে কোন চায়ের বা খাবারের দোকান নেই। স্বামিজীর কাছে শুনতে পাই, চীনা কতৃপক্ষ আজ রাতের খাবার ছাড়া আর কিছুই দেবে না। সঙ্গে কিছু বাদাম চানাচুর ছিল তাই নিয়ে চিবুতে থাকি, কিন্তু তাতে ক্ষুধা আরও বর্ধিত হয়।

এই রেষ্ট হাউসের কাছে ও দূরে অনেক জায়গায় লম্বা খুঁটিতে লাউড স্পিকার বাঁধা আছে। প্রথমে কিছু বুঝতে পারেনি কিন্তু বিকেল চারটে বাজতেই সেই লাউড স্পীকারে চীনা রেডিও-র অনুষ্ঠান প্রচার শুরু হয়ে গেল। অনুষ্ঠানের মধ্যে চীনা ভাষায় সংবাদ, কথিকা ও গান অন্তর্ভুক্ত। ক্রমে সাড়ে চারটা বাজতে বাঁদিকের ডাইনিং হল থেকে ঠং ঠং করে খাবার ঘণ্টা বেজে ওঠে ; আমি ও আরও কয়েকজন খাবার ঘরের দিকে এগিয়ে যাই। কিন্তু গিয়ে শুনি এ ঘণ্টা আমাদের জন্য নয়, রেষ্ট হাউসের কর্মীদের জন্য। আমাদের খাওয়ার ঘণ্টা বাজতে এখনও এক ঘণ্টা দেরী আছে। দেখি চীনারা মেয়ে পুরুষ কর্মীরা হাতে বাটি ও দুটি কাঠি নিয়ে খাবার ঘরের দিকে এগিয়ে চলেছে। দুটি কাঠির সাহায্যে খায়।

একটা কথা জানিয়ে রাখা দরকার ভারতীয় সময় অপেক্ষা চীনা সময় আড়াই ঘণ্টা বেশী। ভারতে যখন বিকেল সাড়ে চারটা, চীনে তখন সন্ধ্যা সাতটা এবং সাতটার পর রেষ্ট হাউসের বাইরে বা রাস্তায় লোকজন একেবারেই দেখতে পাওয়া যায় না। যদিও তখনও সূর্যের আলো থাকে। এই মণ্ডলের কাজকর্ম ও দোকানপাট ভারতীয় সময় বেলা আড়াইটায় বন্ধ হয়ে যায়। প্রথমে খুব অবাক লেগেছিল কিন্তু পরে এর কারণটি বুঝতে পেরেছিলাম। কারণটি এই যে সূর্য অস্ত যাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বরফের ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করে, ফলে কোন মানুষের পক্ষে বাইরে থাকা সম্ভব হয় না। কাজেই রোদ থাকতে ঘরে ঢুকে খিল দিতে হয়।

এখানে বলে রাখি—১৯৮১ সালে প্রথম ব্যাচে দিল্লীর এক ভদ্রলোক কৈলাস-যাত্রা করে ফিরে গিয়ে লিখেছিলেন যে, পুলাণ রেষ্ট হাউসের স্নানের কোন ব্যবস্থা নেই এবং পায়খানা যা আছে তা রীতিমত ভয়াবহ। কথাটি আমার মনে ছিল তাই এখানে আসার কিছু পরে পায়খানার অবস্থা দেখতে যাই কিন্তু অবস্থা এত ভয়াবহ যে কাছ পর্যন্ত এগোতে পারিনি। সহযাত্রীদের খবরটি দিলে তাঁরাও খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন।

ক্রমে আটটা বাজলে আবার খাওয়ার ঘণ্টা বাজে। উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে যাই। ডাইনিং হলটি দু-ভাগে বিভক্ত। বাঁদিকে ভারতীয় তীর্থ যাত্রীদের জন্য ব্যবস্থা করা আছে। দেওয়ালে প্রকাণ্ড কৈলাসের তৈল চিত্র। ভেবেছিলাম চীনারা নিশ্চয়ই ভাল জিনিস খাওয়াবে কিন্তু খাবার দেখে রীতিমত হতাশ হতে হ'ল। গোল টেবিলের চারিদিকে পাঁচটি চেয়ার। টেবিলে বড় ডিসে ক্রিকেট বলের চেয়ে একটু ছোট গোল সাদা পাউরুটি, মুলো শাক সিদ্ধ, বাঁধাকপি পাতা সিদ্ধ, আলু ভাজা, মুলো সিদ্ধ এবং ছোট তিনটে ডিসে নুন চিনি ও লংকা বাটা। পাশে একটি টেবিলে গামলায় গোল চালের ভাত এবং অন্য পাত্রে কোন গাছের পাতা সিদ্ধ জল—"স্যুপ" ঐ খাবারের বাহার দেখে যে কোন বাঙালীর পক্ষে হতাশ হওয়াই

স্বাভাবিক। প্রতিটি খাদ্য দ্রব্য অর্ধসিদ্ধ। কাজেই প্রায় আধপেটা খেয়ে ডাইনিং হল থেকে বেরিয়ে এলাম, যদিও ঐ খাবারের জন্য প্রত্যেককে ৪০ টাকার বেশী খরচা করতে হয়েছিল। সব রান্নাতেই শুকনো লংকার গুড়ো মেশান।

খাওয়া শেষে সকলে ঘরে ফিরে চীনাদের দেওয়া খাবার নিয়ে আলোচনায় মেতে থাকি, কিছুক্ষণ পরে আমরা শুয়ে পড়ি। রীতিমত কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে। বড় ঘরের দরজার খিলটি না থাকায় ঘোষদা চিন্তিত হন। রাত্রে জিনিসপত্র কেউ তুলে নিয়ে যেতে পারে। আমাকে বলেন,—তোমাদের ঘরের দরজাটা খুলে রেখো। অভয় দিয়ে বলি, কোন চিন্তা করবেন না—চোর এলে আমাকে ডাকবেন, সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়বো। জামা কাপড় পরেই ফোমের লেপের তলায় ঢুকি। আমাদের বাংলাদেশে পৌষ-মাঘ মাসে খুব ঠাণ্ডা পড়লে যেমন হয় এখন এখানে তেমনই ঠাণ্ডা। সারাদিনের ধকল ও ক্লান্তির ফলে কিছুক্ষণের মধ্যে চোখ জুড়িয়ে আসে।

১২ই সেপ্টেম্বর সকালবেলা ঘুম ভাঙে। উচ্চতার কারণে ভাল ঘুম হয়নি। গরম জল মুখাজীদা সবটা ব্যবহার করেছেন, বরফের মত ঠাণ্ডা জলে মুখহাত ধুতে হয়। কিছু পরে ব্রেকফার্স্ট। খাবারের মেনু আগের রাত্রের মতই তবে ভাত নেই তার বদলে এক ডিস বাদাম ভাজা আর এক কেটলী দুধ-চিনি ছাড়া 'র' কফি।

রেস্ট হাউসটি ঘুরে দেখার জন্যে বের হয়ে পড়ি। রেস্ট হাউসটি প্রায় দু-একর জায়গা নিয়ে গড়ে উঠেছে। প্রঙ্গণে দাঁড়ালে দেখা যায় দক্ষিণ দিকে বরফে ঢাকা পাহাড় শ্রেণী। যেটি আগের দিন পার হয়ে এসেছি। উত্তরে চীনাদের সরকারী অপিস ও ব্যারাক। পশ্চিমে পুবাং পাহাড় ও তার পিছনে মেঘের মত বরফে ঢাকা মস্ত পাহাড়, পূর্বে খাবার ঘরের পিছনেই একটি ছোট নেড়া পাহাড়। রেস্ট হাউসের গেটের সামনে রাস্তা, রাস্তার ওদিকে চীনাদের অফিস ও কোয়াটার। রেস্ট হাউসের চারিপাশে চীনারাই বাস করে এবং সবাই সরকারী চাকুরে। ৩৭ বছর চীনা শাসনে থেকেও তিব্বতের এই

অঞ্চলে তেমন কোন উন্নতি লক্ষ্য করা গেল না। বাঁদিকে এক ঘর মাত্র তিব্বতী বাস করে; তারা অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন ও দরিদ্র। ভারতীয় তীর্থ যাত্রীদের প্রতি এই তিব্বতী পরিবারের খুব রাগ দেখলাম। মুখার্জীদা ছবি তুলতে চাইলে তিব্বতী বৃদ্ধটি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সে-স্থান ত্যাগ করল। এখানে জিনিসপত্র কিনতে হলে দু-কিলোমিটার দূরে ফর্নালী নদীর তীরে একটি তিব্বতী বাজার আছে, সেখানেই কিনতে হয়। নামেই তিব্বতী বাজার পরিচালনা করে চীনারাই। ঐ বাজারের বিবরণ যথা সময়ে দেওয়া যাবে। রেস্ট হাউসের কর্মচারীদের মধ্যে প্রায় সবাই বয়সে তরুণ এবং তরুণীর সংখ্যাই বেশী এবং সবাই খুব হাসি খুশী। গাইড ওয়াংচু এবং মিঃ সুই নামে রেস্ট হাউসের এক কর্মী এই দু-জন মাত্র ইংরাজীতে কথা বলতে পারে। এখানের জল সরবরাহের ব্যবস্থা মোটেই ভাল নয়। দু-কিমি কর্ণালী নদী থেকে ট্রাকে করে রেষ্ট হাউসে জল আসে। তিব্বতের এই অঞ্চলে দানা জাতীয় খাদ্য শস্য কিছু উৎপন্ন হলেও সবুজ শাক্-সবজী একেবারেই বহু পাওয়া যায় না। দূর থেকে এখানে চালান আসে।

কিছুক্ষণ বাইরে ঘোরাঘুরি করে ঘরে এসে বসি। মুখার্জীদা বলেন, "এত মহা বিপদ হল দেখছি, একটু কথা বলতেই বুকে হাঁপ ধরছে।" কথাটা খুবই সত্যি; আমি আগের দিন থেকেই লক্ষ্য করছি, একটু বেশী কথা বললেই বুকে হাঁপ ধরে, অত্যন্ত ক্লান্তি অনুভব হয়। হয়ত উচ্চতার কারণে এরূপ হয়। ভট্চাযদা আমাদের ছোট ঘরটিতে এসে বসেন। নানা মজার গল্প আরম্ভ করেন। হাসি, আনন্দে সময় কাটে। এক সময় পাশের ঘর থেকে ঘোষদার গলা যায়,—"এহে-হে, ওহে ভট্চায, এ যে ভেঙে চুরে সব ভিজিয়ে দিয়েছে গো।"

"দেখ আবার কি ভাঙলো।" বলে ভট্চাযদা উঠে যান। পিছনে আমিও চলি দেখতে। গিয়ে দেখি ব্যাপারটা এই রকম—ঘোষদা ব্যাগের ভিতর জামাকাপড়ের মাঝে একটি বড় ব্রাণ্ডির বোতল এনেছিল। বোধহয় কারও কাছে শুনেছিলেন যে লিপুলেক পার

হবার সময় ব্রাণ্ডিটা খুব কাজে আসে। আগের দিন মালপত্র ছোঁড়াছুড়ির ফলে বোতল ব্যাগের ভিতরই ভেঙে চুরমার এবং ফলস্বরূপ জামাকাপড় ব্রাণ্ডিতে ভিজে গেছে। ভট্চাযদা ব্যাপার দেখে চটে গিয়ে বলেন,—"আপনি তো আচ্ছা লোক মশাই! গতকাল লিপুলেক পাসে লোকের জীবন বেরিয়ে যাচ্ছিল, তখন জিনিসটা বের করলেন না, আর এখন ভেঙে নষ্ট করলেন তো ?"

"আ-হা-হা, বোঝনা কেন?"—ঘোষদা বোঝাতে চেষ্টা করেন। "আর বুঝে কাজ নেই ; আপনার ওরকম হওয়াই ভাল।" ভট্চাযদা রেগে বাইরে গিয়ে আমাকে বলেন—"শুধু এক বোতল এনেছে মনে করেছ, এখন কত বেরোবে তাই দেখো।" এখন বুঝতে পারি ঘোষদার প্রতিদিন ব্যাগ খোলার রহস্যটা। বোতলটি অটুট আছে কিনা তাই একবার করে রোজ দেখতেন।

ইতিমধ্যে এক ঘটনা ঘটে যায়। দিল্লীর কম বয়সী ওমপ্রকাশ উৎসাহ বসে ফর্ণালী নদীর উপর লোহার পুলের ছবি তোলার অপরাধে চীনা নিরাপত্তা কর্মীরা তাকে ব্যারাকে নিয়ে গিয়ে আটক করে রাখে। খবর পেয়ে মানিন্দার গিয়ে কিছু অর্থদণ্ড ও ক্যামেরার ফিল্ম খুলে দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে আনেন।

বেলা একটা নাগাদ সমস্ত যাত্রীকে রেষ্ট হাউসের মাঝখানে একটি গ্রীণ হাউসের পাশে জড়ো করা হল। মানিন্দার ঘোষণা করলেন, ৩৮ জন যাত্রীকে দুটি দলে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথমে একদল কৈলাস পরিক্রমা করবে এবং দ্বিতীয় দল মানস সরোবর পরিক্রমা করবে। পরে দ্বিতীয় দল যখন কৈলাস পরিক্রমা করবে, প্রথম দল তখন মানস সরোবর পরিক্রমা করবে। এটা করার কারণ হিসাবে বলা যায়—পরিক্রমার পথে যে সব তাবু বা ক্যাম্প করা আছে, সেগুলিতে এক সঙ্গে ৩৮ জনের থাকার ব্যবস্থা নেই। প্রত্যেক পরিক্রমায় তিন দিন সময় লাগে। এরপর মানিন্দার কে কোন দলে আছেন সেই নামগুলি ঘোষণা করেন। এখন দেখা যায় দিল্লীর ৮ জন যাত্রী, বোম্বাইয়ের শেঠজি, শুক্লা, স্বামিজী, বাবাজী, মুখার্জীদা, ঢালিদা, চৌধুরী ও আমি এই কজন

দ্বিতীয় দলে। মানিন্দারও দ্বিতীয় দলে, তিনিই দলনেতা। বাকী সবাই প্রথম দলে। প্রথম দলের দলনেতা করা হয়েছে পুনের এক বদমেজাজী ভদ্রলোক, যার ব্যবহারে যাত্রীরা অনেকেই অতিষ্ঠ। কোন কারণে অর্চনাদিকে দ্বিতীয় দলে ঢোকানো হল। ভেবে দেখলাম এই দল নির্বাচন কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ যাঁরা অভিজ্ঞ—স্বামিজী, বাবাজী, মানিন্দার সকলেই দ্বিতীয় দলে। মনে যাইহোক, মুখ ফুটে কিছু বলার উপায় নেই। তবুও সংগঠন নিয়ে গণ্ডগোল বাধল। পূর্বেই বলেছি ভট্চাযদা ও ঢালিদা দিল্লী থেকে এক সাথে আসছেন, দু-জনের মধ্যে খুবই প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে কিন্তু এখন দু-জনকে দু-দলে রাখার জন্য ভট্চাযদা ভীষণ অসুখী হলেন। মানিন্দরকে বারবার অনুরোধ করলেন দ'জনকে একদলে রাখার জন্য কিন্তু কিছুতেই রাজী হলেন না। এরপর ভট্চাযদা মানিন্দর মহা ক্ষেপে গেলেন। বাংলা ভাষায় যত নামী-দামী গালাগাল আসে সেগুলি একে একে স্বামিজী ও মানিন্দারের প্রতি প্রয়োগ করতে লাগলেন। সামনেও দুজন বাঙালী ভদ্র মহিলা রয়েছেন কিন্তু ওঁর হুঁশ নেই। থামাতে যাই কিন্তু থামেন না। মানিন্দার বাংলা না বুঝলেও হয়ত এক সময় বুঝতে পারেন যে, তাঁর উদ্দেশ্যে খুব ভালো মন্তব্য বর্ষিত হচ্ছে না। তাই ভট্চাযদাকে ডেকে বলেন, "এ ভট্টাচারিয়া, জেবা তমিজাসে বাত করো।" ভট্চাযদা উত্তর দেন—"হাম ক্যা করেগা? হামারা হাই অল্টিচুড এফেক্ট হো গয়া। মানিন্দার রাগ করতে গিয়েও হেসে ফেলেন। ভট্চাযদা কার কাছে যেন শুনেছিলেন—বেশী উচ্চতায় মানুষ মস্তিষ্কের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে—আবোল তাবোল প্রলাপ বকে। এখন সেই শোনা কথাটা কাজে লাগান। আমাকে একান্তে ডেকে বলেন—বল কি? রাগ হবে না? দিল্লী থেকে এক সাথে চলেছি, খাচ্ছি, শুচ্ছি আর কৈলাসে এসে কিনা দুজনে দু-দলে? "ফিরে এসে ব্যাটাদের টাইট করবো।"

আমার চিন্তা হয় ঘোষদার জন্য। বুড়ো মানুষ, আনাড়ী লোকের পাল্লায় পড়ে কত কষ্ট হবে কে জানে! পরে শুনেছিলাম আমার

অনুমান মিথ্যা হয়নি।

এরপর রেস্ট হাউসের ভিতরে চীনা ব্যাঙ্কের শাখায় প্রত্যেক যাত্রীকে তিব্বতে ১৪ দিন থাকা ৪ দিন খাওয়া ও পরিবহন ব্যয় বাবদ ৩৮০ আমেরিকান ডলার জমা দিতে হ'ল। আমার কাছে বাড়তি ৪০ ডলার ছিল, সেগুলি ভাঙিয়ে ১৫০টি চীনা মুদ্রা 'য়ুয়ান পেলাম। ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার একটি ১৭।১৮ বছর বয়সের তরুণী। বিনিময় হার হচ্ছে ১ ডলার=৩.৫ য়ুয়ান। এক য়ুয়ান ভারতীয় প্রায় চার টাকার সমান। গত ১৯৮১ সালে ১০০ ডলারের পরিবর্তে ১৬৬ য়ুয়ান পাওয়া যেত, ... সালে ১৮০ য়ুয়ান কিন্তু এই ৮৭ সালে ১০০ ডলারের বিনিময়ে ৩৫০ য়ুয়ান পাওয়া যায়। এটি উল্লেখ করলাম এইজন্য যে এর ফলে পাঠক চীনের অর্থনৈতিক অবস্থা কিছুটা উপলব্ধি করতে পারবেন।

দুপুরে ভট্চাযদা ও ঢালিদা পুরাং পাহাড়ের নীচে নেপালী উপনিবেশ দেখতে পেলেন। আমি, শিবানী, অর্চনাদি ও ডলিদি ঐ একই উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়লাম। রেস্ট হাউসের সামনের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে থাকি। লোকজন নেই, মাঝে মাঝে গমের আটিভর্তি ট্রাক ও ট্রাক্টর যাওয়া আসা করছে। হেঁটে চলেছি কিন্তু মনে হয় শরীরে কোন ওজন নেই। নিঃশ্বাস নিতেও সামান্য কষ্ট হয়। তিব্বতের এই জায়গাটা ১৫,০০০ ফুট উঁচু। প্রথম দু-একদিন শরীর খুবই হাল্কা লাগে, হাঁটলে মনে হয় যেন উড়ে চলেছি, পা টলমল করে। তবে ৮।১০ দিন থাকার পর আবহাওয়া অনেকটা গা-সওয়া হয়ে যায়। একটি মোড়ের মাথায় এক তিব্বতী মহিলা অবাক চোখে আমাদের দেখতে থাকে। চ্যাপটা মুখ, পরনে কালো আলখাল্লা, মাথায়ও কানে রং বেরং-এর পুঁতি অলংকার। এখান থেকে কর্নালী নদীর অপর তীরে উপনিবেশ দেখা যায়। মনে হয় এই কাছেই কিন্তু তিন মাইল দূরে। তিব্বতের বাতাস খুব সূক্ষ্ম ও ধুলো ধোঁওয়া একেবারেই নেই ; তাই পনের মাইল দূরের জিনিসও মনে হয় এই কাছেই, দশ মিনিটেই পৌঁছে যাব। হঠাৎ সঙ্গের মহিলারা মত পরিবর্তন করেন। রেস্ট

হাউসে ফিরে আসতে চান। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

বিকেলে রেষ্ট হাউসের আঙিনায় স্বামিজীর সঙ্গে গল্প করছি, এমন সময় দু'জন বিদেশী তরুণ এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করেন, এখানে দোকান কোথায় আছে? তাঁদের জানানো হয়,—গেটের পাশে একটি ছোট দোকান আছে। তবে সেটি বিকেল পাঁচটায় বন্ধ হয়ে গেছে। দু'জনের পরিচয় জিজ্ঞেস করে জানতে পারা যায় একজন সুইজারল্যান্ড ও অপরজন অষ্ট্রেলিয়া থেকে এসেছেন। দু'জনে কৈলাস দর্শন করে ফিরছেন। এখন নেপাল হয়ে স্বদেশে ফিরবেন। আমি জিজ্ঞেস করি; কৈলাস কেমন দেখলেন? জবাব দেন—"অপূর্ব, কৈলাসের সৌন্দর্য্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।" শুনেছি বিশ্বের মধ্যে সুইজারল্যান্ড মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্য বিখ্যাত। সেখান থেকে তরুণটি এত কষ্ট করে কৈলাস দেখতে এসেছেন ভাবতেও অবাক লাগে। আরও এক ভদ্রলোক এগিয়ে আসেন। স্বামিজীর প্রশ্নের উত্তরে জানান তিনি নেপালী। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি—নেপালীদের তিব্বতে ঢোকার কোন বাধা নেই। আমার কিন্তু সন্দেহ হয়, কারণ ভদ্রলোকের চেহারা মোটেই নেপালীদের মত নয়। চেপে ধরে বলি—সত্যি বলুন তো, আপনার বাড়ী কোথায়? তখন ভদ্রলোক স্বীকার করেন। তিনি ভারতের বিহার রাজ্যের বাসিন্দা। নেপালে একটা কাজে এসেছিলেন, সেখানে থেকে এক নেপালীকে সঙ্গে নিয়ে সতের দিন ধরে পায়ে হেঁটে আজ সকালে তাকলাকোটে পেঁীচেছেন। মানস সরোবর দর্শনের ইচ্ছা বহুদিনের। লোকটির কথা শুনে আমার দু'চোখ জলে ভরে ওঠে। ভাবি, প্রাণের আকুতি থাকলে মানুষ কত কষ্টই না সহ্য করতে পারে।

রাত্রে ঘরে সকলে পরের দিনের যাত্রা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। আমি দ্বিতীয় দলে আছি, দ্বিতীয় দলের প্রথমে মানস পরিক্রমা করার কথা। কিন্তু আমার মানস পরিক্রমার ইচ্ছা নেই। ৮ দিন ধরে পাহাড়ী পথে ১০০ কিমি হেঁটে ও তিব্বতে দু'দিন আধপেটা খেয়ে শরীর খুবই দুর্বল। এখন যেটা সবচেয়ে বেশী দরকার সেটা হ'ল

একটু বিশ্রাম। মানস সরোবরের তীরে দুদিন বিশ্রাম নেব ঠিক করেছি। তারপর কৈলাস পরিক্রমার কথা ভাবা যাবে।

মানস সরোবরের তীরে

পরদিন রাত থাকতে উঠে ব্রেকফাষ্ট সেরে বাসে উঠে বসি। তখনও অন্ধকার, ঠাণ্ডাও খুব। মনে অসীম আগ্রহ—আজ মানস সরোবর দর্শন হবে। ওঁ নমঃ শিবায় ধ্বনির মধ্যে এক সময় বাস ছাড়ে। পিছনে ট্রাকে মালপত্র। অন্ধকারের মধ্যে হেড্ লাইট জেলে বাস এগিয়ে চলে। ভীষণ উঁচু-নীচু রাস্তা। ছোট সিমেন্টের সেতুর উপর দিয়ে দুটি ছোট নদী পেরিয়ে কিছুদূরে গিয়ে একটি গ্রাম। এই তিব্বতী গ্রামটির নাম তোয়ো। শুনেছি এই গ্রামে কাশ্মিরী জেনারেল জোরাবর সিং-এর সমাধি আছে। ভোরের আলোয় বাসের জানালা দিয়ে ডানদিকে একটি সাদা স্মৃতি স্তম্ভ দেখতে পাওয়া গেল। হয়ত এটিই সমাধি হতে পারে। কাশ্মিরের মহারাজা গুলাব সিং-এর সেনাপতি যোবাবর সিং ১৮৪১ সালে তিব্বত আক্রমণ করেন। দশ হাজার তিব্বতী সৈন্যকে পরাজিত করে তাকলাকোট পৌঁছান। কিন্তু ফেরার সময় একদল চীনা সৈন্যের হাতে তিনি অতর্কিতে নিহত হন। পথের দুপাশে ছোট ছোট গমের ক্ষেত্রে গ্রামবাসীরা এই ভোরেই গম কাটা তোলার কাজে ব্যস্ত। গ্রাম পার হয়ে বেশ কিছুটা পথ চলার পর এক জায়গায় বাস দাঁড়িয়ে পড়ে। জায়গাটি প্রায় সমতল। এই জায়গার নাম সম্ভবত 'বন্দক'। যদিও রোদ উঠেছে তবুও ঠাণ্ডায় হাত-পা জমে যাচ্ছে। রাস্তার ধারে এক দেড় ফুট উঁচু ছোট গাছের ছোট বড় গোলাকার ঝোপ। অনেকটা উল্টানো ঝুড়ির মত। এই গাছগুলির নাম 'ডামা। তিব্বতে ভেড়া, ছাগল ও চমরী গাইয়ের ডামা গাছই প্রধান খাদ্য। ডামা গাছ তিব্বতীদের জ্বালানী কাজেও লাগে। শুনেছি এই গাছগুলি কাঁচা অবস্থাতেও জ্বলে। এছাড়া ছোট ছোট কাশের ঝোপ, তাতে লম্বা শীষে নীল রং-এর ফুল ও দু-একটা দেখতে পাই। ডামা গাছের ফুলের রংও নীল। এখানে ভূ-ত্বক

ছাই রংএর। পিছনে তাকিয়ে দেখি বহুদূরে বরফ ঢাকা পর্বত-শ্রেণী।

আবার বাস ছাড়ে   এক চড়াই রাস্তায় বাস উঠতে থাকে। বাঁ-দিকে পাহাড়, ডানদিকে খাদ। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি—বাসের ঢাকা থেকে দেড় ফুট পাশেই খাদ। কাঁচা রাস্তা হলেও চীনা ড্রাইভার বেশ দক্ষতার সঙ্গে বাস চালাচ্ছে। প্রায় ২০ মিনিট একটানা ওঠার পর চড়াই শেষ হয়। চড়াইয়ের উপর ডানদিকে পাথরের স্তূপের উপর লাল, সাদা, হলদে অসংখ্য পতাকা দেখা যায়। এই জায়গার নাম গুরলাপাস,—উচ্চতা ১৬, ২০০ ফুট। এই গুরলাপাসের উপর দাঁড়ালে বাঁদিকে রাবণ হ্রদ, সামনে কৈলাস ও ডানদিকে মানস সরোবরের এক মনোরম দৃশ্য দেখা যায়। বহু বিদেশী পর্যটক এই জায়গা থেকে দেখা দৃশ্যের প্রভূত প্রশংসা করেছেন। গুরলাপাস থেকে বাঁদিকে বাস নেমে চলে। সিট থেকে উঠে সামনে মানস সরোবর দেখতে চেষ্টা করি কিন্তু দেখতে পাই না। বাসের সিট বরফখণ্ডের মত ঠাণ্ডা। একটি উঁচু ঢিলা পার হতেই বাঁদিকে চোখের সামনেই ভেসে ওঠে দিগন্ত বিস্তৃত নীল জলরাশি। মুখার্জীদা চিৎকার করে ওঠেন—জয়, কৈলাস পতিকী জয়! মানস সরোবর নাকি? না,—এটি রাবণ হ্রদ। কথিত আছে—লংকার রাবণ একবার কৈলাসকে তুলে লংকায় নিয়ে যেতে চান কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও পারেন না। পরিশ্রমের ফলে রাবণের গায়ের ঘাম থেকে এই রাবণ হ্রদ সৃষ্টি হয়েছে। শোনা যায় রাবণ হ্রদের জলও নাকি লোনা। সে যাইহোক, যাত্রীদের চেঁচামেচিতে ড্রাইভার বাস থামালে নেমে পড়ি। বাঁদিকে কিছুটা নীচ থেকে রাবণ হ্রদ আরম্ভ হয়েছে। রাবণ হ্রদের পরিধি ১৩৫ কিমি। শতদ্রু নদী রাবণ হ্রদের উত্তর পশ্চিমদিক থেকে নির্গত হয়েছে। রাবণ হ্রদের গড়ন অনেকটা পশ্চিম বাংলার মানচিত্রের মত। তিব্বতী নাম লাংগাবছো। উচ্চতা ১৪,৯০০ ফুট। রাবণ হ্রদে ছোট ছোট দুটি দ্বীপ আছে। উত্তরে যতদূরে দৃষ্টি চলে শান্ত নীল জল তারপর খয়েরী রং-এর একটি নীচু

পাহাড়ের প্রাচীর। সেই প্রাচীরের মাঝে নয়, একটু বাঁদিকে চেপে কৈলাস শৃঙ্গ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখান থেকে সাদা বরফে ঢাকা পিরামিডের মত দেখতে লাগে। শৃঙ্গের মাঝখানে উপর থেকে নীচ অবধি একটি কালো রেখা। কৈলাস শৃঙ্গের গায়ে সকালের রোদ পড়েছে। কি সৌম্যমূর্ত্তি! একবার দেখলে সংসারের সমস্ত দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে যায়। মনে মনে প্রণাম জানাই, জীবন আজ স্বার্থক। অনেকদিন আগে স্বপ্নে একবার কৈলাসকে দেখেছিলাম আজ মিলিয়ে দেখি স্বপ্নে আর বাস্তবে কোন পার্থক্য নেই। রাবণ হ্রদ লম্বায় প্রায় ১৭।১৮ মাইল, তারও ১৪।১৫ মাইল দূরে কৈলাস কিন্তু এখান থেকে দেখে মনে হয়—এই কাছেই, হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। ক্যামেরা বের করে ছবি তুলি কিন্তু ক্যামেরা এই সৌন্দর্য্য কতটুকু গ্রহণ করতে পারবে, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থেকে যায়। জগৎ সংসার ভুলে কতক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম মনে নেই, এক সময় ড্রাইভার বাস ছেড়ে দিলে বাধ্য হয়ে বাসে উঠতে হয়।

কিছু পরে বাস একটু উঁচুতে উঠতেই ডানদিকে মানস সরোবরের নীল জল চকিতে একবার দেখা যায়। অধীর আগ্রহে বসে থাকি। এক সময় সামনের পাহাড়ের বাধা সরে যায়—চোখের সামনে বিশাল মানস সরোবরের নীল জলরাশি ভেসে ওঠে। বাস একেবারে জলের কিছু আগে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। বাস থেকে নেমে ছুটে গিয়ে মানস সরোবরের জলে হাত ডোবাই। বরফের মত ঠাণ্ডা জল। সরোবরের জল অত্যন্ত স্বচ্ছ। জলের নীচে অনেক দূর পর্য্যন্ত রং বেরং-এর পাথরের নুড়ি দেখতে পাওয়া যায়। সরোবরের তীরেও অজস্র নানা রংএর ছোট ছোট পাথর। সামনের জল ফিরোজা রং কিছু দূরে গাঢ় সবুজ। এখন বেলা ৯টা। সূর্যের আলো পড়ে। সামনের জল ঝিক্‌মিক্ করছে। মৃদু মন্দ বাতাসে সরোবরের জলে ছোট ছোট হিল্লোল। তীর থেকে সামান্য দূরে সূর্য্যের আলো পড়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, মনে হচ্ছে চার-পাঁচটি সোনার পদ্মফুল সরোবরের জলে ভেসে বেড়াচ্ছে। সরোবরের অপর তীর

এখান থেকে ১৩।১৪ মাইল দূরে কিন্তু পরিষ্কার দেখা যায়। এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না যে মানস সরোবরে পেঁছে গেছি। জল নিয়ে তিনবার মাথায় ঠেকাই। একটু জল পান করি। পরে স্বামিজীকে প্রণাম করে বলি, "স্বামিজী মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেন।

পূর্বে রাবণ হ্রদের কথা বলেছি। রাবণ হ্রদ ও মানস সরোবরের পাশাপাশি অবস্থিত। রাবণ হ্রদ বাঁদিকে, মানস ডানদিকে। দুটি হ্রদের মাঝে একটি নীচু পাহাড় আছে। পাহাড়টি উত্তরদিকে চওড়া বেশী, সেখানে রাবণ হ্রদ ও মানসের দূরত্ব ৬।৭ মাইল; সেখানে একটি ছোটনদী দুটি হ্রদের মধ্যে সংযোগ রেখেছে। নদীর নাম শিউ ছু, অনেকে গংগা ছুও বলেন। তিব্বতী ভাষায় 'ছু' শব্দের অর্থ জল।

মানস সরোবরের সৃষ্টি সম্পর্কে পুরাণে যা পাওয়া যায় তা এখানে একটু বলা দরকার। ব্রহ্মার পুত্র মরীচি, বশিষ্ঠ এবং অন্য ঋষি-গণের সাথে কৈলাসে বার বৎসর কঠোর তপস্যা করতে গিয়েছিলেন। স্নান করার জন্য তাঁদের প্রতিদিন কৈলাস থেকে মন্দাকিনী আসতে হত। ঐ বার বৎসরের মধ্যে নামমাত্র বর্ষা হয়নি। শেষে কষ্ট নিবারণের জন্য ঋষিগণ ব্রহ্মার স্মরণ নিলেন। তখন ব্রহ্মা নিজের মন থেকে মানস সরোবরের সৃষ্টি করেন।

মানস সরোবর সৃষ্টি সম্পর্কে ভৌগোলিকরা যাই বলুন না কেন, খৃষ্টপূর্ব ১০০০ থেকে ২৪০০ বৎসরের মধ্যে রচিত পুরাণকারেরা কৈলাস ও মানস সরোবর অঞ্চলের যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে-ছিলেন তা ভাবলে সত্যিই অবাক হতে হয়। ভাষায় মানস সরোবরের বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। মানস সরোবরের তীরে এসে দাঁড়ালে যে প্রকার মানসিক তৃপ্তির অনুভূতি হয়, সেই অনুভূতির আকাঙ্ক্ষা রাজা-মহারাজা ও ঋষি তপস্বীরা করে থাকেন কিন্তু সারাজীবন চেষ্টা করেও তার ধারে কাছে পেঁছতে পারেন না। প্রকৃতির বিশালতা ও মানুষের ক্ষুদ্রতা—এই ব্যাপারটি মানবের তীরে এসে দাঁড়ালে যতটা ভাল বোঝা যায়—মনে হয় পৃথিবীর আর কোথাও ততটা নয়।

মানসের তীরে দাঁড়ালে নিজের অজান্তে সৃষ্টিকর্তার পায়ে মাথা নত হয়ে যায়। শুধু হিন্দুরা নয়, বহু বিদেশীকে মানস সরোবরের প্রতি প্রণাম জানাতে দেখেছি।

মানস সরোবরের পরিধি ৯০ কিমি এবং গড়নটি অনেকটা আফ্রিকা মহাদেশের মানচিত্রের মত। সরোবরের মাঝে গভীরতা ৩০০ ফুট পর্যন্ত পাওয়া গেছে। হ্রদের জলের রং সব সময় এক থাকে না। সূর্যের গতির সঙ্গে রং-এর কিছু তারতম্য হয়। যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে সরোবরের তীরে বালির নাম গন্ধ নেই। নানা রং-এর ছোট ছোট নুড়িতে ভর্তি। শুনেছি কার্তিক পূর্ণিমায় এই হ্রদের জল জমে একখণ্ড বরফের পরিণত হয়ে যায় এবং চৈত্র পূর্ণিমায় বরফ গলে জল হয়ে যায়। পাশে তাকিয়ে দেখি বাবাজী জলে নেমে একের পর এক ডুব দিচ্ছেন, সহযাত্রীরা তাঁর ছবি তুলতে ব্যস্ত।

মিনিট কুড়ি পরে স্বামিজী সকলকে তাড়া দেন। এক ফার্লং দূরে একটি লম্বা রেষ্ট হাউস রয়েছে, সেখানে যেতে বলেন। এই জায়গার নাম সাইদি (Cadi)। রেষ্ট হাউসটি মানস-সরোবরের পশ্চিম তীরে মাঝামাঝি জায়গায়, অতীতের গোসুল গোম্ফার চার কিমি উত্তরে অবস্থিত। তাকলাকোট থেকে এই স্থানের দূরত্ব ৮০ কিমি।

রেষ্ট হাউসের ঘরে ঢুকি। ছটি ঘরের মধ্যে দুটি আমাদের খুলে দেওয়া হয়েছে। প্রতি ঘরে ৪টি করে গদি, বালিস, লেপসহ হাসপাতালের মত লোহার খাট। পাশের ঘর দুটিতে তিনজন তিব্বতী মহিলা রয়েছেন, আমাদের দেখাশুনা করার জন্য। একটি মেয়েকে কিন্তু মোটেই তিব্বতী বলে মনে হয় না। কুড়ি-বাইশ বছর বয়স, সাড়ে চার ফুট লম্বা, গোলাপ ফুলের মত রং, টিকালো নাক। মুখের গড়ন অতি সুন্দর। পরনে ফুলহাতা গোলাপী ব্লাউজ ও গোলাপী আলখাল্লা। মুখে সব সময় মিষ্টি হাসি লেগেই আছে। দ্বিতীয় জন সাড়ে ছয় ফুট লম্বা, কয়লার মত কালো রং সামনের দাঁত-গুলি ভীষণ ভাবে বেরিয়ে আছে। আমরা যে রাক্ষসীর ছবি দেখি

মহিলা ঠিক সেই রকমই তবে সিং দুটো নেই—এই যা। তৃতীয় জনের বয়স কম, তবে তিনি দ্বিতীয় জনের ক্ষুদ্র সংস্করণ। সত্যি কথা বলতে কি? দ্বিতীয় জনকে প্রথম দেখে আমি রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

সাড়ে দশটা বাজে। ভীষণ ক্ষুধার উদ্রেক হতে থাকে। সমস্ত জিনিস বের করা হল। পাশের ঘরের কালো মেয়ে দুটি এসে অবাক চোখে জিনিসপত্র দেখতে থাকে। তাদের মানস সরোবর থেকে জল আনতে বলা হলে তারা জল নিয়ে আসে।

প্রথমে চা তৈরী করি। চা-পর্ব শেষ হবার পর রান্নার কাজে লেগে যাই। বাবাজী বুড়ো মানুষ, ডাক্তার পঙ্গু কাজেই সমস্ত কাজের ভার মুখার্জীদা ও আমার উপর পড়ে। ঠিক হয় খিচুড়ী হবে চাল, ডাল, মশলা সবই আছে কিন্তু তেল নেই। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি আসে—একটা আচারের টিন কেটে ফেলি, দেখি উপরে অনেকটা তেল ভাসছে; সেই তেল রান্নার কাজে লাগিয়ে দি। প্রেসার কুকারটি একটু খারাপ ছিল কিন্তু আমি মেকানিক মানুষ তাই কুকার ঠিক হতে দেরী হয় না।

রান্না চাপিয়ে রেষ্ট হাউসের বাইরে গিয়ে দাঁড়াই। গেটের বাঁদিকে একটি বাঘের মত বড় ভীষণাকৃতি তিব্বতী কুকুর বাঁধা আছে। সর্বাঙ্গ বড় বড় লোমে ঢাকা। একবার মুখ তুলে দেখে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। ডানদিকে বরফ ঢাকা বিশাল মান্ধাতা পর্বত। রাজা মান্ধাতা পুরাকালে ঐ পাহাড়ে তপস্যা করেছিলেন, তাই নাম হয়েছে মান্ধাতা পর্বত। বাঁদিকে একটি ছোট পিরামিডের মত পাহাড়। ঐ পাহাড়ে বরফ নেই। সামনে মানস সরোবর গাঢ় নীল জলে দু-একটি পাহাড় সাদা রাজহংস ভেসে বেড়াচ্ছে। এখন জোরে বাতাস উঠেছে তাই মানসের জলেও বড় বড় ঢেউ দেখা যায়। ঢেউ-এর সঙ্গে সরু লম্বা লম্বা বাদামী রং-এর অনেক শ্যাওলা এসে তীরের কাছে জমা হয়। সরোবরের পূর্বতীরে পাহাড়ের সারি, দেখলে মনে হয় একটি ফিকে খয়েরী রং-এর প্রাচীর সমগ্র সরোবরটিকে

ঘিরে রয়েছে। মানস-সরোবরের তিব্বতী নাম 'ছো-মাভাং'। জল এখানে রেষ্ট হাউস থেকে এক ফার্লং দূরে রয়েছে, কিন্তু ১৯৮১ সালে যখন এই রেষ্ট হাউস তৈরী শুরু হয় তখন জল অনেক কাছে ছিল। বরফ পাতের তারতম্য অনুসারে জল কম বেশী হয়। জল বেশী হলে শিউ ছু-নদী দিয়ে রাবণ হ্রদে গিয়ে পড়ে। মানস সরোবরের উচ্চতা ১৪,৯৫০ ফুট।

রান্না শেষ হবার পর মুখার্জীদা বলেন চল, মানস সরোবরে স্নান করে আসি। শিশিতে সামান্য সরষের তেল ছিল, সেই শিশি নিয়ে জামা কাপড় পরেই মানস সরোবর তীরে হাজির হই। দুপুর সাড়ে বারটা, সূর্য মাথার উপরে কিন্তু এমন ঝড়ের মত ঠাণ্ডা বাতাস বইছে যে সমস্ত জামাকাপড় ও বাঁদর টুপি পরেও তীরে দাঁড়িয়ে থাকা কষ্টকর। রেষ্ট হাউসের সামনে জল থেকে সামান্য দূরে বিভিন্ন রংয়ের পতাকা টাঙ্গিয়ে তিব্বতীরা একটি বিয়ে বাড়ীর গেটের মত জিনিস তৈরী করেছে। সেটিতে আবার তিব্বতীদের চুল, দাঁত, হাড় ইত্যাদি টাঙানো। সেই পতাকার আড়ালে জামা কাপড় খুলে ভাল করে তেল মেখে দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকি। জলে নামতে পারি না কারণ মুখার্জীদার স্নান করা অবস্থায় ছবি তুলতে হবে। মুখার্জীদা জলে নেমে স্নান সেরে উঠে আসেন। এবার আমি নামি। জলে নামতেই সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ শিহরণ বয়ে যায়, জল এত ঠাণ্ডা। এক পা এক পা করে এগোতে থাকি। জলের গভীরতা এমন যে অনেক দূরে গেলেও হাঁটু ডোবে না। পা দুটি শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে মনে হয়। মুখার্জীদা তীর থেকে চেঁচিয়ে বলেন—একদম দেরী করিস্ না, ঝপ করে ডুব দে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীর অবশ এবং মাথা ভীষণ ভারী লাগে। ঠাণ্ডায় হৃদস্পন্দন বন্ধ হবার জোগাড় হয়। দু'কান ভোঁ ভোঁ করতে থাকে। অজ্ঞান হয়ে যাব মনে হয়। আর ডুব দিতে সাহস হয় না, টল্‌তে টল্‌তে তীরে উঠে আসি। শুকনো গামছায় গা-মাথা মুছে জামাকাপড় পরে আস্তে আস্তে রেষ্ট হাউসে ঢুকি। কিছুক্ষণ রোদে বসে তবে শরীর একটু সুস্থ হয়।

খিচুড়ী ও আচার সহযোগে মধ্যাহ্ন ভোজন সারা হয়। ডাক্তার ও মুখার্জীদা আমার রান্নার প্রশংসা করেন। বাবাজীর খাওয়ার ঝামেলা নেই, তিনি সারাদিন বাদাম পেস্তা খেয়ে থাকেন।

খাওয়া দাওয়ার পর অন্য তিনজন বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করেন। কিন্তু আমার বিশ্রাম নেই। ডাক্তারের পা ড্রেসিং করার জন্য গরম জল করতে যাই কিন্তু স্টোভে তেল নেই। স্বামিজী আমাকে বলে গিয়েছিলেন—যা দরকার হবে পাশের ঘরের তিব্বতী মেয়েটিকে বলবে। তাই ভয়ে ভয়ে পাশের ঘরে ঢুকি। ঘরের মেঝেতে স্তুপিকৃত ঘুঁটে, শুকনো ভামাগাছ ও ছাড়ানো ভেড়ার চামড়া। পাশে প্রায় অন্ধকার আর একটি ঘর। দরজার সামনে উঁচু বেদীর উপর সেই ফরসা মেয়েটি বসে রয়েছে। সামনে একটি দু'মুখওয়ালা উনুন। মাঝে টিনের চোঙা দিয়ে ধোঁয়া ছাদের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। উনুনে এক দিকে চায়ের কেটলি, অন্য দিকে গরম জলের পাত্র বসানো। শুনেছি তিব্বতীদের উনুন সারাদিনই জ্বলে এবং সারাদিনই মাঝে মাঝে চা খায়। চা, ছাতু ও মাংস তিব্বতীদের প্রধান খাদ্য। চা দিয়ে ছাতু গুলে তাতে মাংসের টুকরো মিশিয়ে এই মেয়েটিকে পরে খেতে দেখেছিলাম। ঘরের বিপরীত দিকে এক কোণে বেদীর উপর বৌদ্ধদের দেবীর ছোট পিতলের মূর্তি পূজার বাসন ও ঘণ্টা। দেওয়ালে বৌদ্ধধর্মের ছবি টাঙানো। দেওয়ালে মাঝখানে র‍্যাকে একটি বড় টু-ইন ওয়ান দেখে খুবই আশ্চর্য হলাম। পরে দেখেছিলাম সকালবেলা সেই টু-ইন ওয়ানে তিব্বতী ভাষায় বৌদ্ধ মন্ত্র বাজত। সঙ্গে চলত পূজাপাঠ।

ফরসা মেয়েটির পাশে কাপড় জড়ানো মাস-দেড় দুইয়ের শিশুকে শুয়ে থাকতে দেখলাম। প্রথমে পুতুল মনে করেছিলাম কিন্তু পরে ভুল ভাঙলো। কালো মেয়ে দুটি মেঝেতে জামা কাপড় সেলাইয়ের কাজে ব্যস্ত।

ফরসা মেয়েটিকে ঈশারা করে দেখাই যে স্টোভে তেল নেই। মেয়েটি উঠে পাশে রাখা তেলের টিন উপুড় করে দেখায় যে, তাতেও

এক ফোঁটা তেল নেই। মহা সমস্যা! কি আর করি? মেয়েটির কাছে এক বাটী গরল জল নিয়ে ডাক্তারকে দিই।

সাড়ে তিনটে নাগাদ গেটের বাইরে একটি গাড়ী এসে থামার শব্দ হয়। বেরিয়ে দেখি ট্রাকটি মালপত্র নামিয়ে দিয়ে ফিরে এসেছে। গাড়ী থেকে চীনা গাইড ওয়াং চু নেমে আসে। এগিয়ে গিয়ে মিঃ ওয়াং চু-কে বলি, স্টোভ জ্বালানোর তেল নেই, রাত্রে আলোর ব্যবস্থা নেই কিছু একটা করুন।

ওয়াং চু বলে,—নো প্রব্লেম।

ইতিমধ্যে ফরসা মেয়েটি বেরিয়ে আসে। দু'জনে তিব্বতী ভাষায় খানিক কথা হয়, তারপর মেয়েটি তেলের টিন নিয়ে এলে ড্রাইভার গাড়ীর ডিজেল ট্যাংক থেকে এক টিন ডিজেল বের করে দেয়। ওয়াং চু মেয়েটির হাতে কয়েক প্যাকেট মোমবাতি দিয়ে গাড়ীতে চেপে বসে, গাড়ী পুলানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়।

বিকেল বেলা সুপ তৈরী করি। ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় গরম সুপ শরীরে আমেজ আনে। হঠাৎ আমার একটা কথা খেয়াল হতে মুখার্জীদাকে বলি —"মুখার্জীদা, আমি শুনেছি তিব্বতের এই অঞ্চলে খুব ডাকাতের ভয়। ব্যাটারা যদি রাতে এসে জিনিসপত্র সব নিয়ে যায় তবে না খেয়ে থাকতে হবে।

বাস্তবিক আমার কথায় এতটুকু বাহুল্য নেই। ১৯05 সালের আগে সমতল বাসীদের পক্ষে তিব্বতে প্রবেশ করার নানা অসুবিধা ছিল কিন্তু ১৯৩৪ সাল থেকে ভারত-চীন যুদ্ধের আগে পর্যন্ত কৈলাস দর্শনে এসেছেন তারাই জানেন এই অঞ্চলে ডাকাতের ভীষণ উপদ্রব ছিল। বহু যাত্রী ডাকাতের হাতে সর্বশান্ত হয়েছেন, একথা শোনা যায়। ডাকাতের ভয়ে অতীতে যাত্রীরা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে কৈলাস দর্শনে আসতেন। বর্তমানের কথা ঠিক জানি না কিন্তু সাবধান হতে দোষ নেই।

ডাকাতের কথা শুনে মুখার্জীদা ভয় পেয়ে বলেন,—"বলিস্ কি? "এতো মহা বিপদের কথা; দাঁড়া আগে দরজায় খিলটা দি।" বলে

দরজায় খিল দিতে যান, কিন্তু দেখা যায়, ছিট্‌কানি আছে তবে সেটি লাগছে না। দরজায় ছিট্‌কানি লাগছে না শুনে বাবাজীও উঠে এসে চিন্তা প্রকাশ করেন। আমি বলি—"মেকানিক সঙ্গে থাকতে ছিট্‌কানি লাগবে না তা হতেই পারে না। আপনি একটা পাথর নিয়ে আসুন।" মুখার্জীদা পাথর নিয়ে আসেন। দাম্ দাম্ পাথর মেরে বাঁকা ছিট্‌কানি সোজা করি। এখন আর দরজা বন্ধ করতে কোন অসুবিধা হয় না। সকলের ভাবনা দূর হয়। কিন্তু আমার মনে ভাবনা থেকেই যায়। এই রেস্ট হাউসের চারিদিকে ১০।১৫ মাইলের মধ্যে জনপ্রাণী বাস করে না। ডাকাত যদি সত্যিই পড়ে তবে ছিট্‌কানি বা পাশের ঘরের মেয়ে তিনটি, কেউই রক্ষা করতে পারবে না।

রাত্রে সামান্য ম্যাগি নুড্‌লস্ খেয়ে শুয়ে পড়ি। কিন্তু উচ্চতার কারণে ঘুম আসতে চায় না। মানস-সরোবর ১৪,৯৫০ ফুট উঁচু। বুকে যে ধুক্ ধুক্ শব্দ হয় সেটি এখন ধড়াস্ ধড়াস্ করছে।

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে যায়। মানস সরোবরের তীরে দ্বিতীয় দিন। স্টোভে গরম জল চাপিয়ে মানস প্রণাম করার জন্য বাইরে বেরোই। গেট থেকে আবছা অন্ধকারে মানসের জল কালো মনে হয়। হঠাৎ লক্ষ্য করি মানস সরোবরের পূর্ব তীর সোনালী আভায় ভরে উঠছে। বুঝতে পারি সূর্যোদয় হচ্ছে। দৌড়ে ঘর থেকে ক্যামেরা নিয়ে এসে অপেক্ষা করতে থাকি। কিছু পরে অপর তীরে পাহাড়ের মাথায় সূর্য উঠলেই ছবি তুলি। মানস সরোবরে সূর্যোদয়ের দৃশ্য ঠিক ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মনে হচ্ছিল এক প্রকাণ্ড সোনালী ফুলঝুরি জ্বলছে এবং ছটাগুলি সারা আকাশময় ছড়িয়ে পড়ছে। পরে ফটোতেও দেখেছি দু-একটি ছটা মাত্র ক্যামেরা গ্রহণ করতে পেরেছে। মানসে সূর্যোদয়ের ছবি তোলা ভাগ্যের ব্যাপার কারণ অধিকাংশ দিন ভোর বেলায় মানসের পূর্ব তীরে পেঁজা মেঘে ঢাকা থাকে। এই অঞ্চলে পরিষ্কার আবহাওয়া পাওয়াও ভাগ্যের ব্যাপার। স্বামিজীর মুখে শুনেছিলাম—বছর দু-তিন আগে একদলের সঙ্গে স্বামিজী এসেছিলেন, সেবারে চোদ্দ দিনের মধ্যে কোন যাত্রী একটি ফটোও

তুলতে পারেন নি। কারণ চোদ্দ দিন ধরে কৈলাস-মানস সরোবর অঞ্চলটি মেঘ ও কুয়াশায় ঢাকা ছিল।

চা করা, স্যুপ করা, রান্না করা, বাবাজী ও ডাক্তারের ফাই-ফরমাস্ খাটা ছাড়াও আমার আরও একটা কাজ ছিল। সেটি হচ্ছে মানস সরোবর থেকে বাবাজীর খাবার জল আনা। তেষ্টা পেলেই বাবাজী আমাকে ডেকে বলতেন, "খোকা সরোবরসে এক লোটা পানি লে আও—বলে হাতে ঘটিটি ধরিয়ে দিতেন। দিনের মধ্যে বেশ কয়েকবার যেতে হত। কিছু বলতে পারি না। সাধু সেবা, তাও আবার মানস সরোবর তীরে। মহা ভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু সবচেয়ে কষ্ট হোত সন্ধ্যায় জল আনতে। বরফের মত ঠাণ্ডা বাতাস ঠেলে জল এনে স্টোভের সামনে বসে বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে হত। রেষ্ট নেবার জন্য রেষ্ট হাউসে থেকে গেলাম, এখন দেখি উল্টো বিপত্তি।

আজ আর নতুন কোন ঘটনা ঘটে না। পাশের ঘরের কালো মেয়ে দুটিকে আজ আর দেখতে পাই না। জল আনা, বাসন মাজা ফরসা মেয়েটি করে দেয়। ভাষা বোঝে না, দেখা হলেই হাসি মুখে O. K. বলে মাথাটি হেলায়।

বাইরে পাহারাদার কুকুরটি ডেকে উঠলেই মুখার্জীদা বলেন, 'যা, দেখে আয় ডাকাত এলো নাকি?' বেরিয়ে দেখি, মানস পরিক্রমাকারী একজন তিব্বতীকে দেখে কুকুরটি এত তর্জন গর্জন করছে যে দড়ি ছিড়ে ফেলার উপক্রম। তিব্বতের কুকুরগুলি বাঘের মত বড়, গায়ে বড় বড় লোমে ঢাকা, মুখ চিতা বাঘের মত। চোখগুলি কিন্তু খুব শান্ত। গলার আওয়াজ কিন্তু মোটেই ভীতিজনক নয়। আমাদের দেশের কুকুরের খুব ঠাণ্ডা লেগে গলা ধরে গেলে যেমন আওয়াজ বেরোয়, তিব্বতী কুকুরের ডাকটি সেরকম। মাঝে মাঝে কুকুরের ডাক শুনে ফরসা মেয়েটিও বেরিয়ে আসত। আগন্তুক তিব্বতীর সাথে কিছু গল্প করত, দু-একজনকে ঘরে ডেকে চা খাওয়াত।

মানস সরোবরের তীরে জীবজন্তু বলতে দু-একটা ধূসর রংয়ের

খরগোস দেখেছিলাম ; আর দেখেছিলাম কিছু দাঁড় কাক ও চড়াই পাখি। কাকগুলি আমাদের দেশের অপেক্ষা চতুর্গুণ বড় এবং গলার আওয়াজ খুবই গম্ভীর। শুনতে বেশ ভাল লাগে। চোখ দুটি টক্‌টকে লাল।

তৃতীয় দিন ভোরবেলা উঠে গেটের সামনে দাঁড়ায়। ডানদিকে তাকিয়ে দেখি সামনের দক্ষিণ তীরে আবছা কুয়াশায় ঢাকা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আছে। ঐ দিকেই বাকী সহযাত্রীরা আজ পরিক্রমা করে ফিরবেন।

চা খাওয়ার পর চারজনে আলোচনা করে ঠিক হয় যে আগন্তুক সহযাত্রীদের জন্য ট্যমটো স্যুপ ও খিচুড়ী রান্না করা হবে। মহা উৎসাহে রান্না করতে ব স যাই।

বেলা দশটা নাগাদ চারপাশের আবহাওয়া থম্‌থমে হয়ে ওঠে, বাতাসও বন্ধ হয়ে যায়। কিছু পরে চড়বড় শব্দে মোটা দানা চিনির মত বরফপাত শুরু হয়ে যায়। দশ পনের মিনিট পরে বরফপাত বন্ধ হয়। কাঁচের জানালা দিয়ে দেখি রেষ্ট হাউস থেকে সরোবরের তীর পর্যন্ত বরফের পুরু আস্তারণে ছেয়ে গেছে। সহযাত্রীদের কথা ভেবে বাবাজী খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। মানস সরোবর সম্পর্কে হিন্দীতে একটি কবিতা আছে—

মান সরোবর কৌন পরসে
বিন বাদল হিম বরষে।

বিনা মেঘে যে মানস সরোবরে বরফপাত হয়, তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা গেল।

রান্না শেষ হবার পর হঠাৎ আমার একটা কথা খেয়াল হল। শুনেছি মানস সরোবরে পিতৃপুরুষের তর্পন করার নিয়ম আছে। মা মারা গেছেন আজ বছর পনের হল, তারও কয়েক বছর আগে ঠাকুরদা। মানস সরোবর যখন এসেই গেছি তখন তর্পণ করলে কেমন হয় ? তখুনি বাবাজীর সাথে পরামর্শ করি, বাবাজী বলেন,—মাও ঠাকুরদার তর্পণ করার কোন অসুবিধা নেই।”

বাবাজীকে জানাই—আমি ব্রাহ্মণ নই এবং কোন মন্ত্র জানিনা। এই অবস্থায় কিভাবে তর্পণ করা যেতে পারে? বাবাজী বলেন—কোন মন্ত্রের প্রয়োজন নেই। নারায়ণকে স্মরণ করে তিনবার জল নিবেদন করবে।

শুভ কাজে দেরী না করে তখনই মানস সরোবরের কিনারায় চলে যাই। নারায়ণকে স্মরণ করে প্রথমে ঠাকুরদাকে পরে মাকে তিনবার অঞ্জলী ভরে সরোবরের জল নিবেদন করি। যখন মাকে জল নিবেদন করছি, মনে হল মা স্বয়ং সামনে এসে সেই জল গ্রহণ করছেন। আনন্দে চোখে জল এসে গিয়েছিল। পরে স্বামিজীকে ঘটনাটি বলেছিলাম। শুনে উনি বলেছিলেন—দেখলে তো, এই সব জায়গার মাহাত্ম্য কেমন?

বিকেল তিনটে নাগাদ বাইরে বেরিয়ে মানসের দক্ষিণ তীরে অনেকগুলি কালো কিছু নজরে পড়ে। বুঝতে পারি সহযাত্রীরা আসছেন। কিছু পরে কয়েকজন ঘোড়ায় চেপে বাকীরা হেঁটে রেষ্ট হাউসে হাজির হন। রেষ্ট হাউস জমজমাটি লাগে। বাকী ঘরগুলি খুলে সকলের থাকার ব্যবস্থা হয়। সকলের চোখ মুখ রোদে পুড়ে লাল হয়ে গেছে। কারও কারও নাক ভীষণ ভাবে ফুলে গেছে। মাত্র দুটি দিন কিন্তু মনে হচ্ছে প্রত্যেকের বয়স দশ বছর বেড়ে গেছে। ক্লান্তি দূর করার জন্য প্রত্যেককে গরম স্যুপ পরিবেশন করা হয়। অবেলায় কেউ কিছু খেতে চান না। রান্না করে রাখা খিচুড়ী গরম করে রাত্রে সকলের খাওয়ার ব্যবস্থা হয়।

চতুর্থ দিন। আজ সকলের এখানে বিশ্রাম। পরেরদিন আমাদের কৈলাস পরিক্রমায় যাত্রা করার কথা। যে দল এখন কৈলাস পরিক্রমা করছেন তাঁরা পরের দিন এই রেষ্ট হাউসে আসবেন। আজ আমার রান্না করার ঝামেলা নেই। দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন দিল্লীর এক যুবক। একটা কথা বলা হয়নি, আগের দিন সহযাত্রীদের সঙ্গে ফরসা মেয়েটির স্বামী এখানে এসেছে। লোকটি নেড়া মাথা রাক্ষসের মত দেখতে হলেও ব্যবহার ভাল। পুরাকালে তিব্বতের নাম ছিল 'কিম্ পুরুষ

বর্ষ।' নামটি খুবই যুক্তিসঙ্গত ছিল।

সারাদিন সরোবরের তীরে রঙিন পাথর কুড়িয়ে ও ঘুরে বেড়িয়ে সময় কাটাই। শেঠজী তার এক নিকট আত্মীয়ের তর্পণ করবেন, সে ব্যাপারে স্বামিজী বাবাজীর দম ফেলবার ফুরসত্ নেই। প্রায় আড়াইটার সময় তর্পণ শেষ হলে স্বামিজী সকলকে মানসের জল সংগ্রহ করে নিতে নির্দেশ দিলেন। পবিত্র জল নিয়ে আসার জন্য প্রত্যেকেই দু-চারটে পাত্র নিয়ে গিয়েছিলেন। স্বামিজীর নিজেরই ছিল ২৫টি পাত্র। আমার কাছে একটি দুলিটার প্লাস্টিকের পাত্র ছিল, তাতে জল ভরে মুখ সিল করে ব্যাগে ঢোকালাম।

সন্ধ্যাবেলা স্বামিজী পরের দিন সকালের জন্য পায়েস রান্না করতে বসে সকলকে এক প্যাকেট ড্রাই ফ্রুটস্ দিতে বললেন। আমার কাছে না থাকায় দিতে পারলাম না। তখন স্বামিজী জানালেন যে ড্রাই ফ্রুটস্ না দেওয়ার জন্য পরের দিন আমাকে পায়েস দেওয়া হবে না। কথাটি খুবই সামান্য কিন্তু স্বামিজীর মুখে শুনে আঘাত পেয়েছিলাম।

পরের দিন সকালে কৈলাসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার জন্য তোড়জোড় শুরু হয়। মানসে আজ নিয়ে পঞ্চম দিন। কৈলাস পরিক্রমা শেষে তাকলাকোট ফেরার পথে আরও একবার এখানে আসার কথা আছে। সাড়ে আটটার সময় বাস এসে হাজির হয়। মালপত্র বাসে তুলে চেপে বসি। পাঁচদিন মানস সরোবরের তীরে কাটানোর পর মন এখন কৈলাস দর্শনের জন্য উৎসুখ।

এক সময় বাস ছাড়ে। দুই কিলোমিটার যাওয়ার পর রাবণ হ্রদ ও মানস সরোবরের মধ্যে সংযোগকারী শিউ ছু নদীর উপর বাস দাঁড়িয়ে পড়ে। ডানদিকে মানসের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি ছোট পাহাড়ের উপর একটি গোম্ফা ছিল, এর নাম জু-গোম্ফা। এখন গোম্ফা নেই। তার ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। অতীতে মানস সরোবরের চারিদিকে আটটি গোম্ফা ছিল। জু-ভিন্ন অন্য গোম্ফাগুলি ছিল বাসাবর্তে নাংমুনা. ঝিগেফ, সারালুং, বন্তী,

ইয়াংগো, ঠোকর ও গোসনুল। চীনারা তিব্বত দখল করার পর গোম্ফা-গনুলি ভেঙে নষ্ট করেছে, সেই সঙ্গে ধ্বংস করেছে এক সনুপ্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শন গনুলি। মানস সরোবর আমাদের একটি পীঠস্থানও বটে। জনু-গোম্ফার নিকটেই সেই পীঠস্থান।

মানসে দক্ষ হস্তো মে দেবী দাক্ষারণী হর।
অমরো ভৈরব স্তত্র সর্বসিদ্ধি প্রদায়কঃ॥

জনু-গোম্ফার নীচে একটি উষ্ণপ্রস্রবন আছে সেখানে সাদা ধোঁয়া উড়তে দেখা যায়। প্রায় শনুকনো শিউ ছনু নদীর বনুকেও এখানে-ওখানে গন্ধকের সাদ প্রলেপ দেখা যায়। যাত্রীদের ছবি তোলা শেষ হলে আবার গাড়ী ছাড়ে।

উঁচনু নীচনু পথে কিছনু দনুরে এগোনোর পর একটি গ্রামে বাস দাঁড়ায়। এই গ্রামের নাম 'বরখা'। ডানদিকে দনুটি একতলা বাড়ী, দনু-একটি খামার ও দনু-তিনটি কুঁড়ে ঘর নিয়ে বরখা গ্রাম। চীনারা বরখার নাম পরিবর্ত্তন করেছে, এখন পারখা নামে ডাকা হয়।

এরপর বিখ্যাত বরখা ময়দানের মধ্য দিয়ে বাস চলতে থাকে। বরখা গ্রামের পর প্রায় বার মাইল লম্বা একটি সমতল মাঠ আছে, সেটিকে 'বরখা ময়দান' বলা হয়। সামনে কৈলাস শৃঙ্গ দেখতে পাওয়া যায়। শৃঙ্গের উপর দিয়ে মেঘের আনাগোনা। একবার দেখা যায় পরক্ষণে ঢাকা পড়ে। চীনা ড্রাইভার এত জোরে বাস চালাচ্ছে যে গর্ত্তে চাকা পড়লে যাত্রীরা আর্তনাদ করে উঠেছেন। মনে হয় কৈলাস কাছেই কিন্তু রাস্তা আর ফনুরোয় না। ঘণ্টা খানেক চলার পর ময়দান শেষ হয়। বাস বাঁদিকে বাঁক নেয়। বিস্তৃর্ণ জলাভূমির উপর দিয়ে বাস চলতে থাকে। জলাভূমি ঠিকই, তবে এখন শনুকিয়ে খটখটে হয়ে আছে। সমগ্র জায়গাটিতে শনুকনো লম্বা ঘাসের চিহ্ন। চার পাঁচ কিমি জলাভূমির উপর চলার পর বাস উত্তর মনুখে বেঁকে কৈলাসের নীচে দারচিনের দিকে এগোতে থাকে। দনুর থেকে দারচিনের রেস্ট হাউসটি দেশলাই বাক্সের মত ছোট লাগে। দারচিনের কাছাকাছি হতেই বাসের মধ্যে বাবাজী চিৎকার করে ওঠেন "জয়,

কৈলাস পতি কি জয়।” আমরাও সমস্বরে গলা মেলাই। পরক্ষণে বাবজী চেঁচিয়ে ওঠেন—“জয়, শেঠজী কি জয়, জয় L. O. কী জয়। এবার আমি চুপ করে থাকি। কৈলাসের পায়ের কাছে পেঁছে কৈলাসপতির জয়ধ্বনি করাটা স্বাভাবিক কিন্তু শেঠজীর জয়ধ্বনি করার পিছনে কি যুক্তি আছে তা বুঝতে পারি না।

দারচিন রেস্ট হাউসের প্রাঙ্গনে গিয়ে বাস দাঁড়িয়ে পড়ে। দারচিন কৈলাসের ঠিক নীচে হলেও এখান থেকে কৈলাস শিখরের একের আট অংশ মাত্র দেখা যায়। কারণ সামনে একটি ছোট পাহাড় কৈলাসকে আড়াল করে আছে। সামনে ভট্চাযদা, ঘোষদা, ডলিদি ও অন্যান্য যাত্রীরা দাঁড়িয়ে আছেন। বাস থেকে নেমে ভট্চাযদাকে বুকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করি,—দাদা, কেমন বুঝলেন, পরিক্রমা করতে পারব ত?

ভট্চাযদা বলেন,—একদম ভয় খাবে না। ইয়াকের পিছনে চলবে, কষ্ট হলে ইয়াকে উঠে পড়বে।

ঘোষদার কাছে গিয়ে কুশল জিজ্ঞাসা করি। ঘোষদা বলেন,—“ভাইরে, বেঁচে ফিরেছি এই খুব? পরে সব শুনবে।

ডলিদির কাছে খোঁজ নিলাম। তিনিও ভাল ভাবে পরিক্রমা সম্পন্ন করেছেন। ভট্চাযদা ডেকে বলেন,—“বুঝেছ, আমি না থাকলে ঘোষদাকে আর ফিরিয়ে আনা যেত না। কারভে (এক নং দলের বদমেজাজী দলনেতা) ঘোষদাকে মাঝ পথে একা ফেলে রেখে চলে আসছিলেন, আমি একা গিয়ে ঘোষদাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি।”

এর পর আর কথা বলার সুযোগ হয় না কারণ ১নং দলের যাত্রীদের নিয়ে বাস মানস সরোবরের দিকে যাত্রা করে।

উত্তর দক্ষিণে লম্বা দারচিন রেস্ট হাউসে আটটি ঘর আছে। একটি ঘরে মুখার্জীদা, ডলিদি, অর্চনাদি চৌধুরী ও আমি পাঁচজন স্থান করে নি। ঘরে খাট, গদি, লেপ, বালিশ সব কিছু আছে। মালপত্র ঘরে ঢুকিয়ে রাখা মাত্র স্বামিজী সকলকে নিয়ে একটি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে আলোচনা সভা শুরু করলেন। আলোচনার উদ্দেশ্য

কিছু যাত্রীকে পরিক্রমা থেকে বিরত করা। যাঁরা কৈলাস পরিক্রমা করবেন না স্বামিজী তাঁদের হাত তুলতে বললেন। দিল্লী নিবাসী দুজন যুবক হাত তুললেন। তারপর স্বামিজী পাঁচজন বাঙালীর মধ্যে ঢালিদাকে বাদ দিয়ে বাকী চারজনকে পরিক্রমা করতে নিষেধ করলেন। আশ্চর্য হলাম দেখে যে ডাক্তার শুক্লার পা সেপটিক হয়ে এক পা হাঁটার ক্ষমতা নেই, তাকে কিন্তু স্বামিজী পরিক্রমা করতে নিষেধ করলেন না। পরিক্রমা করতে পারবেন না শুনে অর্চনাদি কান্নার ভেঙে পড়লেন। চৌধুরী কম কথার মানুষ, তিনি স্বামিজীকে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে তিনি পরিক্রমার জন্য একটি ইয়াক্ ও একজন ইয়াক ম্যান ভাড়া করবেন। যত টাকা লাগুক ক্ষতি নেই কিন্তু তিনি পরিক্রমা করবেনই। এরপর মুখার্জীদা ও অর্চনাদি চৌধুরীর পন্থা অবলম্বন করলেন। বাকী রইলাম আমি। আমার টাকার জোর কম ছিল স্বামিজী সেটা জানতেন এবং আমি পরিক্রমায় গেলে এই দারচিনে বাবাজীর জন্য বিনা পয়সায় পরিচায়ক পাওয়া যাবে না, সেটাও ভাল করে জানতেন। এই আমাকে আটকাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। প্রথমে পথের দুর্গমতার কথা বললেন কিন্তু আমি তাওয়াঘাট থেকে হেঁটে লিপুলেক পার হয়েছি যেটা স্বামিজী নিজে এবং অধিকাংশ যাত্রী পারেন নি। ব্যাপার দেখে আমিও বলে ফেললাম যে আমিও ইয়াক ম্যান ভাড়া করব।

স্বামিজী বললেন,—"তোমার কাছে ৯০ যুয়ান আছে?" বললাম —৪৫ যুয়ান আছে।

হঠাৎ পাশ থেকে শেঠজী ইংরাজীতে বলে উঠলেন,—"মিঃ দাসের যত টাকা কম পড়বে আমি দিয়ে দেব।"

শেঠজীর কথাটি স্বামিজীর মুখে যেন এক দোয়াত কালি ঢেলে দিল, তিনি চুপ করে গেলেন। তখনকার মত চুপ করে গেলেও স্বামিজী আমার প্রতি যে ভীষণ বিরূপ হয়েছিলেন তার প্রমাণ পরিবর্ত্তিকালে বহুবার পেয়েছি। এই ঘটনার পর স্বামিজীর প্রতি আমার যতটুকু শ্রদ্ধা ছিল সেটুকু নষ্ট হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে

পাঠককে জানিয়ে রাখি পরিক্রমা শেষে শেঠজীকে আমার জন্য কোন অর্থ দিতে হয়নি কারণ কৈলাস পরিক্রমার জন্য একটি ইয়াক এবং মানস পরিক্রমার জন্য একটি ঘোড়ার ভাড়া চীনা কতৃপক্ষ আগেই নিয়ে নেয়। প্রথমে যে ৩৮০ ডলার জমা দেওয়া হয়, তার মধ্যেই ঐ ভাড়া ধরা আছে। ব্যাপারটি স্বামিজী বা মানিন্দার কেউ আগে জানান নি, পরে জানতে পারা গিয়েছিল। তাই ইয়াক ও ইয়াকম্যান নিয়েও আমার মাত্র ৪৫ য়ুয়ান খরচ হয়েছিল।

সভা ভঙ্গ হলে অর্চনাদি, ঢালি ও আমি জায়গাটি ঘুরে দেখার জন্য বের হয়ে পড়ি। দারচিন রেষ্ট হাউসের পিছনে একটি পুরোনো রেষ্ট হাউস আছে। যেটিতে আছি সেটি নূতন হয়েছে। পশ্চিমদিকে ঢালু মাঠের মধ্যে অনেকগুলি তিব্বতীদের তাঁবু। উত্তরে ছোট পাহাড়ের গুহায় অনেক তিব্বতী পরিবার বাস করে। পাহাড়ের মাঝে একটি ঝর্ণা বেরিয়ে এসেছে, সেটি কৈলাস গঙ্গা নামে খ্যাত। পূর্বে ফাঁকা মাঠের মধ্যে 'কৈলাস গঙ্গা' বয়ে চলেছে। দক্ষিণে শুকনো জলাভূমি। রেষ্ট হাউসের উঠানে দাঁড়ালে দক্ষিণে রাবণ হ্রদ ও ববখা ময়দানের সবটা দেখা যায়।

পশ্চিমদিকে তিব্বতীদের তাঁবুর কাছে দাঁড়িয়ে নানা আলোচনা করছি। কাছেই একটি ১৯।২০ বছরের তিব্বতী ছেলে ইয়াকের দড়ি বাঁধছিল। অর্চনাদি ছেলেটির কাছে এগিয়ে গিয়ে হিন্দীতে বলেন,— "ভাই সাব শুনিয়ে, ক্যা এ ইয়াক হামারে সাথ পরিক্রমানে যায়েগী?"

চমকে উঠে ছেলেটিব কথা শুনে। পরিস্কার বাংলায় বলে,— "বাংলায় বলুন, আমি বাংলা বুঝতে পারি।"

তিব্বতীর মুখে বাংলা! অবাক হবারই কথা। আমি এগিয়ে গিয়ে কথা বলে জানতে পারি ছেলেটি কলকাতার এক বাঙালী ডাক্তারের বাড়ীতে কিছু দিন কাজ করেছে। তাই কিছু বাংলা বুঝতে পারে, বলতেও পারে। সামনের 'ইয়াকগুলি দেখিয়ে বলে সেগুলি কৈলাসে যাবে না, তার জন্য অন্য ইয়াক আছে। সেগুলি পরে এখানে আসবে। কৈলাসের দক্ষিণ পাদদেশে একটি মন্দির তৈরী হচ্ছে।

সেই মন্দিরের পাথর ও অন্যান্য মালপত্র বহন করার জন্য এই ইয়াকগুলি ব্যবহার করা হয়। মন্দিরটি — নাগাদ তৈরী হয়ে যাবে।

এই প্রসঙ্গে পাঠককে জানিয়ে রাখি, ...ার উৎপত্তি স্থলের দুপাশে সেলুং ও গোম্পা নামক দুটি ... ...ছিল; মন্দিরটি হয়ত সেখানেই তৈরী হচ্ছে। শুধু এই ছেলেটিই নয়, আরও কয়েকজন তিব্বতী যুবকের সাথে শিলিগুড়িতে দেখা হয়েছিল যারা কিছুদিন কলকাতায় অথবা শিলিগুড়িতে কাজ করে এই বছর তিব্বতে ফিরে গেছে। আমাদের তিব্বতে যাওয়ার ঝামেলা অনেক কিন্তু তিব্বতীদের বাংলায় ঢুকতে তেমন অসুবিধা হয় না। কারণ, নেপাল পার হয়ে দার্জিলিং-এ ঢুকলেই হল বাংলার মানুষের পক্ষে কে নেপালী, কে তিব্বতী বুঝে ওঠা খুব মুস্কিল।

সন্ধ্যা নামার সঙ্গে ঠাণ্ডাও বাড়তে থাকে। জানালায় কপাট বন্ধ করে মোমবাতি জ্বালিয়ে পাঁচ জনে গল্পে মেতে থাকি। মুখার্জীদা নিজের বাড়ীর গল্প করেন। ঢালিদা ও চৌধুরী কেবল অপরের কথা শোনেন, নিজেরা কিছু বলেন না। এতদিন একসাথে আছি, ওদের নামটি ছাড়া আর কিছু জানতে পারা যায় নি।

রাত্রি ৮টায় ম্যাগি খাওয়ার পর শুয়ে পড়ি। শোয়া মাত্র মুখার্জীদার নাসিকা গর্জন শোনা যায়। আমার কিন্তু ঘুম আসতে চায় না। যতদিন তিব্বতে ঢুকেছি ঘুম একেবারেই হয় না। নানা চিন্তা মাথায় ভিড় করে আসে। কোথায় বাঁকুড়া জেলার একটি গ্রাম আর কোথায় তিব্বতের দারচিন। জীবনে এই প্রথম এতদূর আসা। এই নিরবিচ্ছিন্ন শান্তি আর কদিন? ফিরে গিয়ে আবার সেই একঘেয়ে জীবন। এই সব চিন্তায় আধো ঘুমে, আধো জাগরণে রাত শেষ হয়।

কৈলাস পরিক্রমা

ভোর সাড়ে চারটার সময় এক সহযাত্রী চা নিয়ে হাজির হন। তখনও অন্ধকার। চা খেয়ে প্রাতঃকৃত সেরে মুখ হাত ধুয়ে নি। অন্য মালপত্র ঘরে রেখে শুধু শ্লিপিং ব্যাগটি বাইরে বের করে রাখি। সকলের জন্য খাদ্য দ্রব্য বস্তায় পুরে আলাদা করে রাখা হয়েছে। পরিক্রমায় তিনদিন সময় লাগে। এক গ্লাস দলিয়া খেয়ে ব্যাগ কাঁধে, লাঠি হাতে, যাত্রার জন্য তৈরী হই। ক্রমে সাড়ে ছটা বেজে গেলেও ইয়াকের দেখা মেলে না। ঠিক হয় এখন হেঁটে পরিক্রমা শুরু করা যাক। মাঝ পথে ইয়াকে উঠে পড়া যাবে। স্বামিজী, ডাঃ শুক্লা, অর্চনাদি ও চৌধুরী ইয়াকে যাবেন বলে রেষ্ট হাউসে থেকে যান, বাকীরা হেঁটে পরিক্রমা শুরু করে পশ্চিম দিকে এগোতে থাকি।

এক মাইল প্রায় সমতল পথ। ডানদিকে ছোট পাহাড়, বাঁদিকে জলাভূমি। সমতল ভূমির পর পথ ক্রমশঃ উঠতে থাকে। দুপাসে ডামা গাছের ঝোপ মাঝে সরু পায়ে চলা পথ। এক সময় দেখি সহযাত্রীরা সবাই এগিয়ে গেছেন, আমি সবার পিছনে। এই দলে যারা কৈলাস দর্শনে এসেছেন আমি ছাড়া প্রত্যেকেই হিমালয়ের কয়েকটি দুর্গম তীর্থ দর্শন করার পর কৈলাস যাত্রায় বেরিয়েছেন। কিন্তু আমি একেবারেই আনাড়ী। দুর্গম তীর্থে যাওয়া তো দূরের কথা জীবনে এই প্রথম হিমালয় দেখছি। যদিও লিপুলেক হেঁটে পার হয়েছি তবুও তিব্বতে হেঁটে চলতে শরীর খুব হাল্কা লাগে, নিশ্বাসের কষ্ট হয়। মনে জোর এনে এগোতে থাকি।

কিছুদূর যাওয়ার পর দেখি শিবানী ও তার স্বামী মুকেশ পথের ধারে বসে আছে। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি, হেঁটে চলতে কষ্ট হওয়ায় ইয়াকের জন্য অপেক্ষা করছে। ভাবলাম ইয়াক ভাড়া করে কষ্ট করতে যাব কেন? আমিও ওদের পাশে বসে পড়লাম।

প্রায় আধঘণ্টা পরে ইয়াকগুলি এসে পেঁছালো। ১৬।১৭টি

ইয়াক। মোষের মত বড়, কালো রং শিংগুলি সরু, সারা গা বড় বড় লোমে ঢাকা। চোখগুলি কিন্তু অদ্ভুত রকমের। লেজটি আমাদের ঠাকুর ঘরের চামরের কথা মনে করিয়ে দেয়। ৬।৭টি ইয়াক মালপত্র বোঝাই, বাকীগুলি চড়ার জন্য। স্বামিজী একটি ইয়াকে উঠে পড়তে বলেন। ইয়াক ম্যানের হাঁটুতে পা দিয়ে উঠে পড়ি। আশ্চর্য হবার কিছু নেই, ইয়াকে চড়ার নিয়মই ঐ রকম। ঘোড়ায় যেমন লাগাম, জিন ইত্যাদি থাকে, ইয়াকে সেসা কিছুই নেই। পিঠে একটি হ্যাণ্ডেল লাগান কাঠের পাটাতন বাঁধা আছে, পিছনের দিকে বসে সেই হ্যাণ্ডেল শক্ত করে ধরে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। প্রথমে উঠে বেশ মজা লাগে।

ইয়াকে উঠে বসে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গী ও মুকাভিনযের সাহায্যে সঙ্গী ইয়াক ম্যানের নামটি জানার চেষ্টা করি। অনেক চেষ্টাব পর নামটি জানতে পারি,—'নরবু'। এই নাম জানার ফলে পরবর্তি সময়ে আমার খুব সুবিধা হয়েছিল। কাবণ মাঝে মাঝে ইয়াকগুলি পিঠে সয়ারী নিয়েই পাহাড়ে উঠে অথবা খাদের ধারে ডামা গাছ খেতে যেত তখন পিঠে বসে থাকা যাত্রী পরিত্রাহী চিৎকার করতেন কিন্তু ইয়াক ম্যানরা তিব্বতী ভাষা ছাড়া অন্য কিছু বুঝত না বলে সেই চিৎকারে কর্ণপাত করত না। আমার ক্ষেত্রে কিন্তু এরকমটি হোত না, ইয়াক একটু এদিক ওদিক হলেই 'নরবু' বলে হাঁক দিতাম। চোখের পলকে নরবু এসে ইয়াকের দড়ি ধরে সামনে হেঁটে চলত।

যাই হোক এখন নরবুকে ডেকে মুকাভিনয়ের সাহায্যে বোঝাতে থাকি সোনা, মানিক আমার, সঙ্গেই থেক, ছেড়ে যেওনা, ইয়াকের পিঠ থেকে গড়িয়ে খাদে পড়লে আর বাড়ী ফিরতে পারব না ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কি বুঝল জানিনা, তবে মাথা দুচার বার এদিক ওদিক হেলিয়ে মুখে গোঁক প্যাঁক আওয়াজ করল। যাক অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম।

ডামা গাছের মধ্য দিয়ে চড়াই রাস্তা। ডানদিকে পাহাড় থাকায় কৈলাস দেখতে পাওয়া যায়। এক মাইল যাওয়ার পর চড়াই শেষ হয়।

বাঁদিকে পাথর সাজান স্তূপ, তাতে অসংখ্য পতাকা। উৎরাই বেয়ে একটি নদী গর্ভে নামতে হয়। বাঁদিকে একটি ছোট নদী বয়ে চলেছে। নদীর গভীরতা আট-দশ ইঞ্চি মাত্র। দুদিকে পাহাড়ের মাঝে আধ মাইল প্রশস্ত নদী গর্ভ। পথ ডানদিকে বাঁক নেয়। সামনে বহুদূর পর্যন্ত একই ভাবে দেখতে পাওয়া যায়। উত্তর মুখে এগিয়ে চলেছি। সামনে নরবু হেঁটে চলেছে। পরনে ফুল প্যান্ট, লাল পাড় বসানো কালো আলখাল্লা, মাথায় মেয়েদের মত দুদিকে বিনুনী। লম্বা পাতলা চেহারা, বয়স ২৫।২৬। রং শ্যামলা।

এই ইয়াকম্যানরা ইয়াকগুলি চালনা করে শিষের মাধ্যমে। চলা, থামা, পথচ্যুত ইয়াককে পথে ফিরিয়ে আনা এ সবই শিষের মাধ্যমে হয়। সাতজন ইয়াকম্যানের দুজনে কম বয়সী ছোকরা ছিল খুবই ফচ্‌কে। তারা মাঝে মাঝে এমন শিষ দিত যে ইয়াকগুলি চলতে চলতে হঠাৎ দৌড়তে আরম্ভ করত। পিঠে আসমানে বসে থাকা যাত্রীর কি অবস্থা হোত তা সহজেই অনুমান করা যায়। সেই দেখে ছোকরা দুটো খুব মজা পেত, দাঁত বের করে হাসত। ব্যাপারটা এত অসহ্য হয়ে উঠেছিল যে পরিক্রমার শেষ দিন আমি এক ছোকরাকে লাঠি নিয়ে মারতে পর্যন্ত গিয়েছিলাম।

কি আর করি? বসে বসে অতীতের কথা চিন্তা করতে থাকি। অতীতে কৈলাস পরিক্রমার পথে তিনটি গোম্ফা ছিল। এক নিয়ান্দি, যার নীচে বসে আছি; দুই ডেরাফুক আজ যেখানে আমাদের রাত্রি বাস; তিন জুনথুলফুক যেখানে আগামী কাল আমরা পৌঁছাবো। দারচিন থেকে ডেরাফুকের দূরত্ব পনের কিমি। অতীতে এই গোম্ফাগুলিতে যাত্রীদের আহার আশ্রয় দুই-ই মিলত। তখন কৈলাস যাত্রায় সরকারী ব্যবস্থাপনা কিছুই ছিল না। ইচ্ছা আর মনের জোর এই দুটি থাকলেই তখন কৈলাসে আসা যেত। নিঃসম্বল অবস্থায় এলেও ক্ষতি ছিল না। কারণ, সীমান্তবাসী ভোটিয়ারা এবং তাকলা-কোট মণ্ডিতে ব্যবসা করতে আসা ভারতীয়রা কৈলাস যাত্রীদের সেবা ও সাহায্য করাটাই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করত। কৈলাস

যাত্রাপথের গ্রামগুলির লোকের মধুর ব্যবহার শুনে বা পড়ে অনেকেই কৈলাস যাত্রায় উৎসাহী হয়েছেন এমন নজীর আছে। শুধু কৈলাস নয়, কৈলাসের পথ ও পথের মানুষগুলির মধুর ব্যবহারও ছিল কৈলাস যাত্রার অঙ্গ। কিন্তু আজ আর সেদিন নেই। পট পরিবর্তন হয়েছে। তাওয়াঘাট থেকে লিপু পাস পর্যন্ত ১০০ কিমি হেঁটে এসেছি কিন্তু এমন একজনও মানুষ খুঁজে পায়নি যাদের কথা শ্রদ্ধেয় প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় পড়েছিলাম। সীমান্তবাসী ভোটিয়াদের চোখে মুখে ছিল সন্দেহ, ঈর্ষাও অবিশ্বাস। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে আমরা যেন অন্য দেশ থেকে এসে ভারতের ঐ অঞ্চলে গেছি। একটা কথা বললে পাঠক বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না। সীমান্তবাসী ভোটিয়াদের চেয়ে চীনা তরুণ-তরুণীদের ব্যবহারের মধ্যে অনেক বেশী অন্তরঙ্গতার সুর দেখেছি।

এখন কৈলাস পরিক্রমার কথায় ফিরে আসি। পনের মিনিট কেটে গেছে। উঠে নদীর ধারে দেখতে যাই। তখনও উনুন জ্বালানো হয়নি। নরবুকে ডেকে তাড়াতাড়ি করতে বলি। একজন তিনটি পাথর সাজায়, অন্যজন কিছু শুকনো গোবর কুড়িয়ে আনে তারপর আগুন জ্বলে। ফিরে এসে স্বামিজীকে খবর দিলে তিনি মুকেশকে সঙ্গে নিয়ে হেঁটেই ডেরাফুকের দিকে যাত্রা করেন। এই জায়গায় বসে থাকাও কষ্টকর। বারোটা বাজে, সূর্য মাথার উপরে কিন্তু এত জামা-কাপড় পরে থেকেও মনে হচ্ছে খালি গায়ে রয়েছি। ঠাণ্ডায় বুক গুরগুর করে কাঁপছে। অগত্যা পাইচারী করে শরীর গরম করার চেষ্টা করি। এক সময় নদীর ধারে গিয়ে তিব্বতীদের চা পান পর্ব দেখতে থাকি। তিব্বতীদের চা খাওয়ার কথা পূর্বে বইয়ে অনেক পড়েছি, এখন স্বচক্ষে দেখার সুযোগ হয়। জল গরম হলে জলে চা দেওয়া হয়। আমাদের দার্জিলিং চা নয়, চীন দেশের চা। তারপর জল ফুটলে একটি পাঁচলিটার প্লাসটিকের পাত্রে সেই চা সিদ্ধ জল ঢালা হয়। এরপর পাত্রের ভিতরে কিছুটা চমরী গাইয়ের মাখন ও কিছু লবণ পুরে পাত্রের মুখ বন্ধ করে খুব খানিকটা ঝাঁকুনি দেওয়ার

পর চা তৈরী শেষ হয়। প্রত্যেক ইয়াকম্যান কাঠের বাটী বের করে চায়ের সঙ্গে ছাতু মেখে পরমানন্দে খেতে থাকে, সঙ্গে চলে গল্প-গুজব। তিব্বতীরা যে ছাতু খায় তার নাম 'শাম্পা'। গম ভেজে গুড়ো করে ছাতু তৈরী করে। আমি ভাবলাম চা আসরে যখন হাজির আছি, তিব্বতীরা চা একটু খেয়ে দেখলে কেমন হয়? একটা নতুন অভিজ্ঞতা হবে। ওয়াটার বটলের গ্লাসে একটু চা নিয়ে খেতে শুরু করি। প্রথমে তিতো লাগে, পরে খেতে ভালই লাগে। চা খাওয়ার পর শরীর বেশ গরম হয়ে যায়। এই চা খুব পুষ্টিকর এবং তিব্বতীদের ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচায়। আমার চা খাওয়ার জন্য ডাঃ শুক্লা আমার প্রতি খুবই বিরক্ত হয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে মানিন্দারের কাছে আমার নামে নালিশ করেছিলেন। তাঁর মতে আমাদের মত ভদ্রলোকের পক্ষে তিব্বতীদের সঙ্গে মেলামেশা করাটা মোটেই শোভনীয় নয়।

আবার যাত্রা শুরু হয়। পথ বলে কিছু নেই, নদীগর্ভ দিয়ে চলতে হচ্ছে। দুপাশে মাঝে মাঝে তিব্বতী হরফ খোদাই করা অনেক পাথর জড়ো করা আছে। মাইল দুই যাওয়ার পর একেবারে কৈলাসের পায়ের কাছ দিয়ে পথ। এখানে পেঁছে সবাই মূক হয়ে যায়। অপলক নয়নে তাকিয়ে দেখে কৈলাস কি ভীষণ, কৈলাস কি সুন্দর। কিছু দূর গিয়ে ইয়াকম্যানরা নদীতে জল খেতে যায়। জল খেয়ে নদীর ধারে শুয়ে শুয়ে গল্প গুজব চলতে থাকে। আমাদের ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলেও করার কিছু নেই। এখানে তিব্বতীরাই ভরসা। তিব্বতীরা যদি ক্রিকেট খেলত তবে ওদের জল পানের বিরতি আধ ঘণ্টা দিতে হ'ত একথা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি। আধ ঘণ্টা পরে জল খাওয়া শেষ হলে যাত্রা শুরু হয়। ডানদিকে পাহাড়ের ঢাল দিয়ে ইয়াক চলেছে, কখন পিঠ থেকে গড়িয়ে নদীতে পড়ব এই আশঙ্কা নিয়ে এগিয়ে চলেছি। বাঁদিকে নদীর অপর তীরে খাড়া হাজার ফুট নেড়া পাহাড়, মাথায় বরফের প্রলেপ। তাকালে একটা অজানা ভয়ে গা শিরশির করে ওঠে। কিন্তু না তাকিয়ে পারা যায়

না। কারণ ভয়ংকরেরও একটা সৌন্দর্য আছে। জায়গাটা খুবই থমথমে ও নীরব। কিছু দূরে স্বামিজী ও কয়েকজন যাত্রী দাঁড়িয়ে ছিলেন। সবাই এক সাথে চলতে থাকি। সামনে মাইল দুই প্রায় সমতল পাথুরে ভূমি, তারপর পাহাড়ের প্রাচীর। একজন বয়স্ক তিব্বতীর হাত ধরে হেঁটে চলেছি। লোকটির নাক দিয়ে শ্লেষ্মা ঝরছে। যে হাতে নাক পরিষ্কার করছে সেই হাতেই আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে। কিন্তু কিছু মাত্র ঘৃণা হচ্ছে না। কৈলাসের মজাই এই। এখানে এলে লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, কাম, ক্রোধ, লোভ কিছুই থাকে না।

সাড়ে চারটা বেজে গেছে, সূর্য ডুবে গেছে অনেকক্ষণ, ঠাণ্ডা বাতাস ও আরম্ভ হয়েছে কিন্তু ডেরাফুকের দেখা নেই। পথ বলে কিছু নেই, পাহাড়ের নীচ দিয়ে চলতে চলতে আরও অনেকখানি গিয়ে এক সময় ডেরাফুক ক্যাম্পে পৌঁছলাম। সন্ধ্যা নামতে তখন বেশী দেরী নেই।

ডানদিকে ছোট পাহাড়, বাঁদিকে নদী, মাঝখানে একটু চালু জায়গায় তিনটি তাঁবু নিয়ে ডেরাফুক ক্যাম্প। দুটি তাঁবু যাত্রীদের জন্যে, তৃতীয়টিতে ক্যাম্পের কেয়ার টেকার একজন তিব্বতী তরুণ সপরিবারে বাস করে। তাকে দোরজী বলেই ডাকা হোত। দোরজীর স্ত্রী এত সুন্দরী যে ভারতের নামকরা সিনেমা অভিনেত্রীরা তার কাছে কিছুই নয়। ভাবি কৈলাস তো স্বর্গই, সেখানে অপ্সরা থাকাই স্বাভাবিক। দোরজীর বছর দেড়েকের ফুটফুটে ছেলেটি এই ঠাণ্ডায় কি করে থাকে, সেই ভেবে অবাক হই। দোরজী ও তার স্ত্রী উনোন ধরানো, গরম জল করে দেওয়া, নদী থেকে জল আনা এইসব করে যাত্রীদের সেবা করে।

সন্ধ্যা সাতটার সময় তাঁবুর ভিতর স্লিপিং ব্যাগের ভিতর ঢুকি। ডেরাফুক ১৭,০০০ ফুট উঁচু। এখানে রাত্রে এত ঠাণ্ডা যে বলে বোঝানো যাবে না। ভাগ্যক্রমে আমার শোবার জায়গাটি তাঁবুর দরজার সামনেই। উল্টোদিকে মাথা রাখা যাবে না, কারণ সেদিক

খুবেই ঢালু। ১০,০০০ ফুট উঁচুতে এই অবস্থায় রাত কাটানো কি কষ্টকর তা একমাত্র ভুক্ত ভুগিরাই জানেন। কৈলাস পতি মাথার কাছেই আছেন তিনিই কষ্টলাঘব করেন। তাঁবুর অপর প্রান্ত থেকে মেহেরা এসে নিজের বাড়তি লেপটি আমার মাথায় ঢাকা দিয়ে চলে যায়। কষ্ট কিছু কম হয়। ঠাণ্ডার জন্য রাতটি প্রায় জেগেই কাটিয়েছি।

ভোব চারটে বাজতেই উঠতে হয়। ঠাণ্ডার তো কথাই নেই। মোটা চামড়ার গ্লাভস পরে থাকা সত্ত্বেও হাতের আঙুলগুলির কোন অনুভূতি নেই। হাতে পায়ে সিন সিন ধরলে যেমন হয়, দুহাত পায়ের এখন সেই অবস্থা? নাক, মুখ অবশ। প্রাতঃকৃত সারার জন্য গরম জল নিয়ে তাতে কিছু ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে মগটি বালতিতে ডোবাতে গিয়ে ঠক্ করে শব্দ হল, টর্চ জেলে দেখি বালতির জলে বরফ হয়ে জমে আছে।

সাড়ে চারটে নাগাদ এক গ্লাস পায়েস খেয়ে যাত্রার জন্যে তৈরী হলাম। আজ আমাদেব কৈলাস পরিক্রমার দুর্গমতম অংশটি অতিক্রম করতে হবে। সেটি হচ্ছে ভোলসা পাস, প্রায় ১৯,০০০ ফুট উঁচু। মানিন্দার সকলকে হাঁটতে বললেন কারণ ইয়াকে চাপলে ঠাণ্ডায় হাত পায়ের রক্ত জমে যেতে পারে।

কৈলাস পতিকে স্মরণ করে হাঁটা শুরু করি। পাথর খণ্ড ছড়ানো মৃদু চড়াই পথ। দু-একটা জলধারা পথ অতিক্রম করেছে, তবে সেগুলি বরফ হযে জমে গেছে। হেঁটে গেলে মচমচ্ শব্দ হয়। কিছু দূর গিয়ে বাঁদিকে নদীব অপর তীরে ভেরাফুক গোম্ফা দেখা যায়। এখান থেকে এক কিমি। অতীতে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা দুর্গের মত দোতলা গোম্ফা ছিল। বর্তমানে সাদা ইঁটের পাঁজার মত দু-একটি ঘর দেখা যায়। ডানদিকে দুটি পাহাড়ের মাঝে কৈলাস শিখর দেখতে পাই। চারি পাশে আবছা অন্ধকার থাকলেও কৈলাস শিখরে সদ্য ওঠা সূর্যের আলো পড়ে সোনার মত ঝক্ঝক্ করছে। একটা ছবি তুলে এগিয়ে চলি। নিয়ান্দি গোম্ফার নীচ থেকে কৈলাস শিখর বরফ ঢাকা সুডোল গম্বুজের মত দেখায়। এখানে কৈলাস

অন্যরূপ। শিখরে দুটি লম্বা কালো দাগ থাকায় দেখায় যেন অতিকায় একটি ফণা।

কিছু পরে সামনে একটি সামান্য চওড়া নদী। নদী গর্ভ বড় বড় পাথর খণ্ডে ও স্থানে স্থানে বরফে ভর্তি। হেঁটে পার হওয়া বিপদজনক তাই ইয়াকে উঠে পড়ি। ইয়াক অত্যন্ত কৌশলে পাথরের মাঝ দিয়ে এঁকে-বেঁকে নদী পার হয়। নদীর পরই এক খাড়া পাহাড়। পাহাড়ের গা বড় বড় সূচালো পাথর খণ্ডের মাঝ দিয়ে ইয়াকগুলি উঠে চলেছে। এই ওঠার সময় ইয়াকগুলি নিজেদের মধ্যে ঠেলাঠেলি, গুঁতোগুঁতি ও মারামারি শুরু করে দিল। ফলে হ'ল কি ; যাঁরা ইয়াকে চেপে উঠছিলেন তাঁরা অধিকাংশ প্রপাত ধরণী-ফলে। কেউ কেউ লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন। আমার পাশে একটি ইয়াক চলছিল তার পিঠে দুটি বাঁধা ছিল। ইয়াকটি বিদ্যুৎ গতিতে হঠাৎ ঘুরে যাওয়ার ফলে বাঁশ আমার বাঁকে আঘাত করল এবং আমি ইয়াকের পিঠ থেকে ছিটকে পড়লাম। এরকম অবস্থায় একটা সাংঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্চর্যের কথা ইয়াকের পিঠ থেকে ছিটকে পড়ার পর মুহূর্তে আমার মনে হল কে যেন আমাকে দু'হাত লুফে নিয়ে আস্তে আস্তে পাহাড়ের উপর বসিয়ে দিল। বাঁশ অত জোরে বুকে লাগা সত্বেও কোন ব্যাথা অনুভব হয়নি। কি করে কি হ'ল বুঝে উঠতে বেশ খানিকটা সময় লেগেছিল। তারপর কৈলাস পতিকে প্রণাম জানালাম, তিনিই রক্ষা করেছেন। এরপর আর কেউ ইয়াক চড়তে রাজী হলেন না। এক পা ওঠেন, দু মিনিট বিশ্রাম করেন, এইভাবে উঠতে লাগলেন।

চড়াই শেষ হবার পর সামান্য ফাঁকা জায়গায় উঠে এলাম। এখান থেকে সম্পূর্ণ কৈলাসকে দেখতে পাওয়া যায়। সামনে কোন পাহাড়ের বাঁধা নেই। গৌরী পট সমেত একটি বিশাল শিব লিঙ্গ। সম্পূর্ণ বরফে ঢাকা তবে এবছর বরফ বেশী নাই। কৈলাস শিখরের উচ্চতা ২২,০২৮ ফুট। সোনালী সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত ; উপরে মেঘ মুক্ত নীল আকাশ। দেখে আশ মেটে না। মনে হয় কৈলাস কাছেই,

হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়।

কৈলাসের তিব্বতী নাম কাংরিনপোচে। তিব্বতী মতে কৈলাসের আদি দেবতা "ধর্মপাল"। তাঁর পরনে ব্যাঘ্র চর্ম, এক হাতে ত্রিশূল অন্য হাতে ডম্বরু। ভারতের হিমালয়ের তীর্থগুলি কৈলাস-মানস সরোবরের একটা পার্থক্য আছে। হিমালয়ের তীর্থগুলিতে মন্দির অথবা গুহা, মূর্ত্তি অথবা পূজিত হয় এমন মাধ্যম আছে কিন্তু কৈলাস-মানস সরোবরে সেসব কিছু নেই। প্রকৃতিই এখানে দেবতা। প্রকৃতি সৃষ্ট দেবতার মত ভাষা আজও সৃষ্টি হয়নি তাই ভাষার দ্বারা কৈলাসের বর্ণনা দেবার স্পর্ধা আজ পর্যন্ত কারও হয়নি, হবেও না।

অপলক নয়নে তাকিয়ে ছিলাম। এক সময় নরবু তাড়া দেয়। পথ কিছুটা ভাল তাই ইয়াকে উঠে পড়ি। পথ বাঁদিকে বাঁক নেয়। বাঁদিকে পাহাড়, নীচে অজস্র ভাঙা পাথা। সামনে আবার এক খাতা চড়াই। পূর্ব অভিজ্ঞতা স্মরণ করে আগেই ইয়াকের পিঠ থেকে নেমে পড়ি কিন্তু হেঁটে উঠতে খুবই কষ্ট। কষ্ট বলতে একমাত্র শ্বাস কষ্ট। এই জায়গাটা ১৮,০০০ ফুট উঁচু। সমতল বাসীদের পক্ষে হেঁটে উঠতে শ্বাস কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। মনের জোর হারাই না। লম্বা চেহারার এক তিব্বতীর হাত ধরে উঠতে থাকি। লোকটি নিজের পিতলের ত্রিশূলটি আমার হাতে দেয়। লোকটি অবিরাম মুখে বলে চলেছে—"ওম মনি পেহাম হুঁ"। আমিও ওঁর সাথে গলা মেলাই। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ি, আর ওঠা সম্ভব নয়। মনে হচ্ছে বুকটা এখনই ফেটে যাবে। একটি তিব্বতী ছেলে কাছে এসে ইশারা করে দেখায়—আমার পিঠে উঠে বস, পিঠে করেই তোমাকে উপরে পোঁছে দিচ্ছি। কিন্তু কম বয়সী ছোকরার পিঠে উঠতে বিবেক বাধে, তাই অসম্মতি জানাই। ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করে এক পা এক পা করে উঠে এক সময় চড়াই শেষ হয়।

বড় বড় পাথর খণ্ড ভর্তি একটু লম্বা সমতল জায়গা। হলদে রং এর ঘাস বের হবার আগেই ইয়াকগুলি চেটে চেটে জায়গাটা তেল তেলে করে রেখেছে। এখানে মিনিট পনের বিশ্রাম নেওয়া হয়।

তারপর আবার চলা শুরু। ডানদিকে বেঁকে কিছু পরে আবার এক খাড়া পাহাড়। পাহাড়ের গা বড় বড় পাথর খণ্ডে পূর্ণ। এই পাহাড়ের শিখর দেশের নাম ডোলমা পাস। কৈলাস পরিক্রমা কালে একটা জিনিস আমি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেছি, ১২।১৮ হাজার ফুট উঁচুতে দাঁড়িয়ে থাকলেও নিঃশ্বাসের কষ্ট হয়। কিন্তু ইয়াকের পিঠে চললে নিঃশ্বাসের তেমন কষ্ট হয় না। এর কারণ কি তা বলতে পারব না। এই দুদিনে ইয়াকের পিঠে বসাটাও বেশ রপ্ত হয়ে গেছে। পিঠে বসে পা দুটো ইয়াকের পেটে শক্ত করে সেঁটে রাখলে পড়ার কোন আশঙ্কা থাকে না। তবে ইয়াক দৌড়তে শুরু করলে আলাদা কথা।

ডোলমা পাসের নীচে ৬০।৭০ ফুট পথ খুবই দুর্গম। পাথর খণ্ডে ভর্তি জায়গাটা এত খাড়া হ'য়ে ইয়াকের পিঠে বসে থাকাই মুশকিল। অধিকাংশ যাত্রী ইয়াকের পিঠ থেকে নিচে পড়তে লাগলেন। ইয়াকম্যানদের সর্দার এক মাঝ বয়সী তিব্বতী নাম— 'প্রেমা'। যাত্রীরা সকলে প্রেমার নাম ধরে চিৎকার করতে আরম্ভ করেন—প্রেমা আমাকে তোল, প্রেমা আমাকে বাঁচাও। আমার লক্ষ্য ছিল ডানদিকের খাদের প্রতি, সেখানে গড়িয়ে পড়লেই সর্বনাশ। মনে আছে ঐ ৭০ ফুট পথ অতিক্রম করতে আধ ঘণ্টারও বেশী সময় লেগেছিল।

ডোলমা পাসের উপর হাজির হয়। এই জায়গা পূর্ববর্ণিত পাহাড়ের শিখর দেশ। ৪০ ফুট লম্বা, ২০ ফুট চওড়া একফালি জায়গা। উচ্চতা প্রায় ১৯,০০০ ফুট। পাশের প্রথমেই ডানদিকে মানুষ সমান বড় চতুষ্কোন এক প্রস্তর খণ্ড। প্রস্তর খণ্ডের গায়ে রং দিয়ে তিব্বতী ভাষায় অনেক কিছু লেখা এবং তিব্বতীদের দাঁত, চুল, হাঁড় দিয়ে সাজানো। চারিদিকে বিভিন্ন রং-এর পতাকা। এই প্রস্তর খণ্ড তিব্বতীদের 'ডোলমা' ও হিন্দুদের গৌরীদেবী বলে পূজিত হন।

গৌরী মাকে দর্শন করব কি? নিজেকে নিয়েই অস্থির। প্রচণ্ড

শ্বাস কষ্ট শুরু হয়ে যায়। এখানের বাতাস এত ঠাণ্ডা যে নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নিলে নাকের ভিতরটা লঙ্কা বাটা লাগার মত জ্বালা করে। সঙ্গে শ্বাস কষ্ট নিবারণের জন্য দু'পুরিয়া মাত্র ওষুধ ছিল। ভেবেছিলাম খুব দরকার না পড়লে ব্যবহার করব না। এখন এক পুরিয়া বের করে মুখে ফেলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিকের মতে শ্বাস কষ্ট উপশম হয়ে গেল। আর কোন কষ্ট নেই। একটি পাথরের উপর বসে বিশ্রাম নিই।

এক সময় স্বামিজীর ডাক শুনে ডোলমা দেবীর সামনে এগিয়ে যাই। স্বামিজী মন্ত্র পড়তে শুরু করেন। দিল্লী থেকে নিয়ে যাওয়া একটি নারকেল ও এক প্যাকেট মিছরী মায়ের পায়ের কাছে রাখি, একটি ধূপ জ্বালাই। মায়ের কাছে কিছুই চাই না—মানে পরিবেশটা এমন যে কিছু চাওয়ার কথা মনেই হয় না। সাধু-সন্তেরা বলে থাকেন, ডোলমা দেবীকে দর্শন করলে মানুষের নবজন্ম লাভ হয়। জানি না সত্যি কি না।

কিছু পরে মাকে প্রণাম জানিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে থাকি। বড় বড় পাথর খণ্ডের মাঝে সরু পায়ে চলা উৎরাই পথে। সামান্য গিয়ে ডানদিকে অনেক নীচে গৌরী কুণ্ডে হ্রদ দেখতে পাই। ডিম্বাকৃতি হ্রদ। শুনেছিলাম এই হ্রদ সারা বছর বরফে আবৃত থাকে। কিন্তু এখন হ্রদে সামান্য ঘোলাটে সবুজ জল দেখতে পাওয়া যায়। কোথাও বরফ নেই, কৈলাসও এখান থেকে দেখতে পাওয়া যায় না।

উৎরাই পথে নেমে চলেছি। আমার সামনে ১৬।১৭ বছরের দুটি নেপালী ছেলে মেয়ে চলেছে। চলার পথে ছেলেটি অনর্গল নেপালী ভাষায় আমার সাথে কথা বলে চলেছে। ওর কথায় জানতে পারি সঙ্গের মেয়েটি ওর বোন। দুজনে পিঠে দুটি ব্যাগ ঝুলিয়ে সুদূর নেপাল থেকে কৈলাস পরিক্রমা করতে এসেছে। আজই সন্ধ্যায় দারচিন পেঁছে যাবে। চেষ্টা করি ছেলেটির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে কিন্তু পারি না। কাঠ বিড়ালীর মত লাফিয়ে চলতে

চলতে ছেলে মেয়ে দুটি এক সময় দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেও ভাই-বোনের মধুর ব্যবহার হয়ত কোনদিনই ভোলা সম্ভব হবে না।

হাজার খানেক ফুট নীচে নেমে সামনে এক মাইল প্রশস্থ প্রস্তর ময় ঢালু জায়গা। সহযাত্রীরা সবাই পিছনে, আজ আমি একাই এগিয়ে চলেছি। ভেবে দেখলাম একা চলা নিরাপদ নয়, পথ ভুল হতে পারে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দু-চার জন নেমে আসার পর আবার চলা শুরু করি। এই জায়গায় ১০০ গজ লম্বা, ৫০ গজ চওড়া ও ২ ফুট উঁচু এক খণ্ড কঠিন বরফ দেখতে পেলাম, অথচ আশে পাশে অনেক দূর পর্যন্ত কোথাও বরফ নেই। খানিক ঢালু পথ পার হয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে ভীষণ উৎবাই। পথ ঝুর ঝুরে মাটিতে খুবই পিচিছল। লাঠিতে ভর দিয়ে খুব সাবধানে নামতে হয়। একবার পা পিছলে পড়লাম, পাথরে ঠেকে গেলাম তাই রক্ষা, কোন দুর্ঘটনা ঘটলো না। পিছনে কতগুলি তিব্বতী মেয়ে পুরুষ নেমে আসছিল, তাদের একজনের হাত ধরে সেই ভীষণ উৎরাই পথ নেমে একটি নদী তীরের হলদেটে ঘাসে ছাওয়া ভূমিতে দাঁড়ালাম। ডোলমা পাস থেকে এখানে পেঁছুতে আড়াই ঘণ্টা সময় লেগেছে। এরপর এক মাইল হেঁটে নদীর তীরে সবুজ মাঠে যেখানে স্বামিজী ও অন্যান্য সহযাত্রীরা বসে রয়েছেন, সেখানে গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

যে জায়গায় বসে আছি সেটা কৈলাসের পূর্ব দিক। এখান থেকে বহু দূরে পাহাড়ের মাথার উপর কৈলাসের সামান্য অংশ দেখা যায়। সামনে একটি পাহাড় খণ্ড খণ্ড হয়ে নদীর উপর ভেঙে পড়েছে। বেলা ২টার সময় মানিন্দার ছয় জন যাত্রীকে নিয়ে দারচিনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন। বেলা আড়াইটায় আমি হাঁটা শুরু করলাম। পাথরের স্তূপ পার হলাম, নীচে নদী বয়ে চলেছে। কিছু গিয়ে আবার ইয়াকে চাপলাম। দুপাশে পাহাড়, বাঁদিকে নদী। নদীর ডান তীর ধরে এগিয়ে চলি। পরিবেশ খুবই থমথমে ও নির্জন। এইসব জায়গায় এসে পৃথিবীতে যে ট্রেন-বাস, বাড়ী-ঘর, রাস্তাঘাট ও ভাল

সুখ সুবিধা আছে সেটা কল্পনা করাও কষ্টকর হয়ে পড়ে। ডান-দিকে একটি ছোট তাঁবু, হয়ত পরিক্রমার পথে কোন তিব্বতী পরিবার রাত্রিবাস করবেন। নদীর ডান তীর দিয়ে উঁচু নীচু সরু পথ, পাথর পাশে অনেক খরগোসের গর্ত। মাঝে মাঝে তিব্বতী হরফ খোদাই করা পাথরের স্তূপ।

মাইল দুই যাওয়ার পর নদীর সঙ্গে পথ ও ডানদিকে বাঁক নেয়। আরও এক মাইল এগিয়ে দুই পাহাড়ের মাঝে সিকি মাইল লম্বা একটি মাঠে হাজির হই। বাঁদিকে নদী। এই জায়গার নাম—জুনথুল ফুক। ডানদিকে উঁচুতে পাহাড়ের গুহায় একটি গোম্ফা দেখা যায়। গৈরিক রং, সাদা পতাকা দিয়ে সাজানো। মাঠের শেষ প্রান্তে দুটি তাঁবু নিয়ে জুনথুলফুক ক্যাম্প। ক্যাম্পের কেয়ার ঠেকার একজন মাঝ বয়েসী চীনা, নাম—শে-তিন। লোকটির লম্বা পাতলা গড়ন, রং কালো, চোখে গগল্‌স্‌, সামনের একটি দাঁত সোনায় বাঁধানো। শে-তিন খবর দেয় আধ ঘণ্টা আগে চারটার সময় মানিন্দার এখান থেকে দারচিনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। মধ্যাহ্নে স্বামিজী বলেছিলেন—আজ জুনথুলফুকে রাত্রি বাস করা হবে না। এক-বারে দারচিনে গিয়ে বিশ্রাম নেওয়া যাবে। ডেরাফুক থেকে জুনথুল-ফুক কুড়ি কিমি। জুনথুলফুক থেকে চারচিন পনের—একদিনে ৩৫ কিমি চলার মত সামর্থ সকলের আছে কিনা তা অবশ্য তিনি চিন্তা করেন নি।

কিছু পরে মালবাহক ইয়াকগুলি এসে পৌঁছানো মাত্র সহিসরা মালপত্র খুলে মাটিতে নামিয়ে রাখে এবং নিজেদের রাত্রি বাসের জন্য তাঁবু খাটাতে শুরু করে। আমি নিষেধ করি কিন্তু কর্ণপাত করে না। আরও কিছু পরে বাকী যাত্রীরা এবং সবশেষে স্বামীজী এসে হাজির হন। মাটিতে মালপত্র নামানো দেখে স্বামিজী রেগে অগ্নিশর্মা হন। তাঁকে জানাই—নিষেধ করা সত্ত্বেও সহিস কথা শোনে নি। শে-তিন ভাল হিন্দী জানে—সে স্বামীকে এখানে থেকে যেতে অনুরোধ করে, কিন্তু স্বামিজী রাজী হন না। এরপর শে-তিনের সঙ্গে স্বামিজীর

কথা কাটাকাটি শুরু হয় এবং ব্যাপারটা চরমে ওঠে। এক সময় শে-তিনকে বলতে শোনা যায়—মনে রাখবেন, এটা ভারত নয়, এটা চীন দেশ, চীন সরকার আপনাদের জন্য লক্ষ্য টাকা খরচ করে থাকার ব্যবস্থা করেছে আর থাকবো না বললেই হোল ?

এরপর স্বামিজী রাগে নির্বাক হয়ে যান এবং সিদ্ধান্ত নেন তিনি একাই দারচিন যাবেন। একা ছেড়ে দেওয়া ভাল দেখায় না তাই শিবানীর স্বামী মুকেশ অনিচ্ছা সত্বেও সঙ্গে যেতে রাজী হয়। স্বামিজী সকলের কাছে যতগুলি টর্চ ছিল সংগ্রহ করেন। আমরা এই কজন প্রাণী সারারাত এই পাণ্ডব বর্জিত মাঠে পড়ে থাকব, আমাদেরও যে একটা টর্চের প্রয়োজন থাকতে পারে, এটা তাঁর খেয়াল হয় না। বাধ্য হয়ে জানাই—আমার টর্চটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। স্বামিজী আগেই রেগে ছিলেন, এখন আরও একদফা আমার উপর রেগে গিয়ে গজ্‌গজ্‌ করতে করতে চারচিন যাত্রা করলেন।

শে-তিন আমাকে বলে—যাত্রীরা এক রাত্রি বাস করবে বলে গত চার মাস যাবৎ তাঁবু খাটিয়ে একা এখানে বসে আছি। এ বছর ছটি দল এখানে থেকে গেছে, শেষে আপনারা যদি এখানে রাত না কাটিয়ে চারচিন চলে যান, তবে আমার খারাপ লাগে না ? আপনিই বলুন।

শে-তিনের যুক্তি অস্বীকার করতে পারি না। বেচারী চার মাস একাকী এখানে বসে আছে। যাত্রীরা এক রাত্রি এখানে থাকলে তারও ভালো লাগে, কিন্তু স্বামিজী যদি শে-তিনের দুঃখটা বুঝতেন।

কথা শুনে লোকটিকে কেমন ভাল লেগে যায়। তাছাড়া এত তাড়া হুড়োর কি আছে ? এক রাত্রি বিশ্রাম নিয়ে পরের দিন ধীরে সুস্থে গেলে ক্ষতিটা কোথায় ? বরং সেই ভাবে কৈলাস পরিক্রমার কর্মসূচী নির্দ্ধারণ করা আছে।

আগের দিন ডেরাফুকে রাত কাটিয়েছি। ঠাণ্ডা ছিল প্রচণ্ড। জুনথুলফুকে ঠাণ্ডা একটু কম হলেও জায়গাটা ভীষণ থমথমে। চারিদিকে কিসের যেন একটা অজানা ভয় ওতপেতে আছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে শে-তিনকে মনে হচ্ছে অন্য জগতের বাসিন্দা মানসের তীরে

চারজনে দু-রাত কাটিয়েছি; কিন্তু এই ভয় ভাবটা ছিল না। ব্যাপারটা শুধু আমি না প্রত্যেকেই উপলব্ধি করতে পারছেন। মুখ দেখে তাই মনে হচ্ছে আমি প্রস্তাব করি, সমস্ত রাত দুজন পালা করে পাহারা দেওয়া হবে। সবাই রাজী হন কিন্তু শেষে দেখা যায় প্রত্যেকই রাতটি জেগেই কাটিয়েছেন। ভোর হয়। দিনের আলোর সঙ্গে ভয় ভাবটা কেটে যায়। বাইরে বেরিয়ে দেখি ঠাণ্ডা আছে তবে কম। উনুনের পাশে একটি ঠাণ্ডা জলের প্রস্রবন ছিল সেটি বরফ হয়ে জমে গেছে। যে ঠাণ্ডায় বরফ জমে, তিব্বতে সেটিকে কম ঠাণ্ডা ধরতে হবে। আমরা উঠে পড়লেও ইয়াকম্যানদের ঘুম আর ভাঙতেই চায় না। অনেক সাধ্য-সাধনার পর সকলে ওঠে।

চা খাওয়ার পর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ যাত্রা শুরু হয়। মন এখন খুব হাল্কা। কৈলাস পরিক্রমার কঠিন অংশগুলি যেমন ড়েরাফুক, ডোলমা পাস প্রভৃতি কৈলাস পতির কৃপায় নির্বিঘ্নে পার হয়ে এসেছি, আজ দুপুরে চারচিন পেঁছালেই নিশ্চিন্ত। জুনথুলফুকের সামান্য পর একটা ঝর্ণা পার হতে হয়। জলে বেশী নেই।

নদীর ডান তীর দিয়ে আগের মতই পথ, তবে খুব উঁচু-নীচু। ইয়াকের পিঠ থেকে গড়িয়ে পড়ার ভয় সর্বদাই থেকে যায়। কখনও কখনও হেঁটে, কখনও ইয়াকে চার-পাঁচ মাইল যাওয়ার পর পথ খুবই বিপদ-সংকুল। পাথরের ফাঁক দিয়ে খাড়া উৎরাই। হেঁটে নামলেও পাথরের ফাঁকে শরীর আটকে যায়। কিছু পথ এই ভাবে নামার পর পাহাড়ের গায়ে দেড়-দু ফুট ঝুরঝুরে মাটির পথ। বাঁদিকে দু-আড়াইশো ফুট নীচে নদী। এই পথে ইয়াকের পিঠে চড়ে মোটেই যাওয়া যায় না। হেঁটে চলাও বিপদজনক। জুতোর তলায় মোটা-মোটা খাঁজ না থাকলে খুব পা হড়কায়। আমার জুতোর তলাটি গড়ের মাঠের মত মসৃণ, তাই সমস্ত পথটি প্রেমার হাত ধরে পার হই। প্রেমা বলে চলেছে 'ওম্ মনিপেহাম্ হুঁ', আমিও গলা মেলাই। প্রেমা আমার দিকে তাকিয়ে মুচ্‌কি হাসে। অনেকখানি চলার পর সামনে দুই পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে রাবণ হ্রদের নীল জলরাশি চোখে পড়ে।

প্রেমাকে রাবণ হ্রদ দেখিয়ে বলি—'প্রেমা, লাংসাক ছো'। রাবণ হ্রদের তিব্বতী নাম আমার মুখে শুনে প্রেমা অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। আমি বলি—লাংসাক ছো—রাবণ হ্রদ। প্রেমা কথাটি মুখস্থ করতে করতে আমার পাশে চলে।

এক সময় পাহাড়ী পথ শেষ হয়। সঙ্গে আসা নদী সামনের সমতল জলাভূমিতে হারিয়ে যায়। সামনে দিগন্ত বিস্তৃত সমতল ভূমি, ডানদিকে রাবণ হ্রদ। পথ ডানদিকে বাঁক নেয়। ক্যানেলের উঁচু পাহাড়ের নীচে যেমন পায়ে চলা পথ থাকে, এখানে পথ সেরকম। মাইল দু-তিন দূরে দারচিন রেস্ট হাউস। এক সময় সামনে সমতল মাঠের মাঝে নিজের ঘরটি আমাকে দেখায়। মাইল দুয়েক দূরে কিন্তু মনে হয় কাছেই। ঘরের দেওয়াল চারটি রয়েছে। কোন ছাদ নেই। গরীব তিব্বতীরা ঘরের ছাদ করতে পারে না, প্রয়োজন হলে ছাদে পাল খাটিয়ে নেয়।

কিছু পথ হাঁটার পর ইয়াকে চড়ে কৈলাস গঙ্গা পার হয়ে দারচিন রেস্ট হাউসে হাজির হই। তখন বেলা ১১টা। আগের দিন আসা যাত্রীরা হৈ হৈ করে ছুটে আসেন। আনন্দের বন্যা বইতে থাকে। বাবাজী এবং দিল্লীর দুজন তরুণ,—যাঁরা পরিক্রমায় যান নি তাদের সঙ্গে মিলিত হই।

দারচিন রেস্ট হাউসে আসার পর স্থানীয় পুরুষ ও মহিলা তিব্বতীরা এসে প্রতি ঘরে ঢুকে যাত্রীদের দেখে যেতে লাগলেন। আমরা যেন একটা দর্শনীয় বস্তু। এক ধর্মপ্রাণা তিব্বতী বৃদ্ধা এলেন, তাঁর হাতে একটি জপযন্ত্র। তিব্বতীরা অনেকে এই জপযন্ত্র ঘুরিয়ে জপ করেন। বৃদ্ধার হাত থেকে জপযন্ত্রটি নিয়ে আমিও খানিক ঘুরিয়ে দেখে নিলাম। বেশ মজা লাগছিল। অপর এক বৃদ্ধ এসে আমার সামনে ডান হাতের বুড়ো আঙুল তুলে ধরে নাচাতে লাগলেন। তিব্বতে কারো সামনে বুড়ো আঙুল নাচানো কিন্তু মোটেই অসম্মান জনক নয়। আমরা যেমন কাউকে সম্মান জানাতে হলে হাত জোড় করে নমস্কার করি, তিব্বতে কাউকে সম্মান জানাতে

হলে বুড়ো আঙুল নাচানোটাই প্রথা। অর্চনাদিকে ডেকে বৃদ্ধাটিকে কিছু খাবার দিতে বলি. খাবার পেয়ে বৃদ্ধাটি আনন্দের সঙ্গে খেতে শুরু করেন।

দু-চারজন যাত্রী গ্রামের ভিতর গিয়ে চামর ও পিতলের তৈরী পুরানো তিব্বতী নিদর্শন বস্তু কিনে আনলেন। এক যুবক আমার কাছে কিছু পাথর বিক্রী করতে এল, কিন্তু কিছু না কিনে ফিরিয়ে দিলাম। পরে চিন্তা করেছিলাম দু-একটা কিনতে হোত, কারণ বাংলায় ঐ সব পাথর পাওয়া যায় না। দামও খুব বেশী। কৈলাসের গায়ে খড়ি মাটির মত এক প্রকার জিনিস পাওয়া যায়। এক বৃদ্ধা প্রসাদ হিসাবে ঐ জিনিস খেতে দিয়েছিলেন। এছাড়া পালং শাকের শিষের মত এক প্রকার গাছ পাওয়া যায়, যেগুলিকে 'কৈলাস ধূপ' বলে। জ্বালানো হলে সুগন্ধ বের হয়।

আমাদের পাশের ঘরটিতে কয়েকজন আমেরিকান ও দু-জন জার্মান তরুণ-তরুণী আশ্রয় নিয়েছেন দেখতে পেলাম। কিছু পরে তরুণটি নিজেই আমার সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিলেন। সামনে কৈলাস গঙ্গার অপর তীরে মাঠের উপর দু-দল আমেরিকান পর্যটক তাঁবু ফেলেছেন। সে এক এলাহি ব্যাপার। ৪০ জনেরও বেশী পর্যটক আছেন। দুপুরে সামনের আমেরিকান ক্যাম্প থেকে দলনেতা আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ভদ্রলোক জন্ম সূত্রে সুইজারল্যান্ডের, বর্তমানে আমেরিকার বাসিন্দা। উপগ্রহ থেকে তোলা কৈলাসের ছবি আমাদের দেখালেন। কৈলাস-মানস সরোবর, লিপুলেক পাস, প্রভৃতি অত্যন্ত সুন্দর ভাবে বুঝতে পারা যায়। ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করি—তিব্বতে কতদিন থাকবেন? জবাব দেন, —"চল্লিশ দিনের প্রোগ্রাম নিয়ে আসা হয়েছে, দরকার হলে আরও বাড়াতে পারি।" একটা কথা ভেবে পাই না—কৈলাস-মানস সরোবর হিন্দু ও বৌদ্ধদের তীর্থক্ষেত্র, ভারতীয়-তিব্বতী-নেপালীদের কৈলাস পরিক্রমায় আসাটা স্বাভাবিক কিন্তু এই যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এত পর্যটক কৈলাস পরিক্রমা করতে আসেন—সেটা কিসের

টানে? উত্তরটা সেদিন দারচিনে বসে খুঁজে পাইনি—পেয়েছিলাম বাড়ী ফিরে আসার পর। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা যাবে। চোদ্দদিনের মধ্যে একশ'র বেশী বিদেশী পর্যটককে আমি দেখতে পেয়েছিলাম।

দারচিন রেষ্ট হাউস থেকে সূর্যাস্তের সময় যে দৃশ্য দেখা যায় তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। দক্ষিণ দিকে ২৫।৩০ মাইল আকাশ ও ভূমিতে গোলাপী ও নীল রংএর স্তর দেখতে পাওয়া যায় এবং দুই রংয়ের মিশ্রিত আভায় গোটা এলাকাটি আলোকিত হয়ে থাকে। ক্রমে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রি নামে। ইতিমধ্যে ভাঁড়ারে টান পড়েছে বুঝতে পারা যায় তবে শেঠজী সঙ্গে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য নিয়ে গিয়েছিলেন তাই খুব একটা অসুবিধা হয় না। *

সকাল হয়। এবার ফিরে যাওয়ার পালা। সকাল থেকেই যাত্রীদের মধ্যে উৎসাহের অন্ত নেই। কিন্তু আমার মনে কেমন একটা বিচ্ছেদ বেদনার সুর বাজতে থাকে, হাসি আনন্দে অংশ নিতে পারি না। এ যেন স্বর্গ হতে মর্ত্তে প্রত্যাবর্ত্তন।

সাড়ে নটা নাগাদ বাস এসে যায়। হুড়োহুড়ি করে চাপা শুরু হয়। বাসের একদিকে রেষ্ট হাউসের প্রাঙ্গনে বাবাজী মারফত শেঠজীর দান-ধর্ম চলছে, অপর দিকে বারান্দায় বসে দু-তিনটি বৃদ্ধা গল্প করে চলেছেন। দান-কর্মের দিকে তাদের লক্ষ্য নেই; আগ্রহও নেই।

"ওঁ নম শিবায়—ধ্বনির মধ্যে বাস ছাড়ে। ক্রমে জলাভূমি পার হয়ে বরখা ময়দানের মধ্য দিয়ে বাস চলতে থাকে। জার্মান তরুণ-তরুণী দু-জন আমাদের বাসে উঠে পড়েছেন। উদ্দেশ্য লাসা থেকে কাঠমাণ্ডু, সেখান থেকে স্বদেশ যাত্রা। তরুণটি ভাঙা ইংরাজীতে জানান—এই নিয়ে দুবার তিব্বতে আসা হোল। গত বছর লাসা, এবছর কৈলাস। আমি তরুণটিকে ভারতে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাই। উত্তরে বলেন ভারতে ভীষণ গরম।

বরখা, গঙ্গা ছু পার হয়ে বাস এক সময় মানস সরোবরের

তীরে সাইদি রেষ্ট হাউসের সামনে হাজির হয়। এখানে ১নং দলের মানস পরিক্রমা কারী যাত্রীদের সাথে মিলিত হই। বেলা সাড়ে বারোটায় রেষ্ট হাউস প্রাঙ্গণে আরম্ভ হল এক বিরাট যজ্ঞ, উদ্দেশ্য যাত্রীদের মঙ্গল কামনা। আয়োজনে কোন ত্রুটী নেই, দিল্লী থেকে সমস্ত জিনিস নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু ফ্যাসাদ বাধলো আগুন জ্বালাতে গিয়ে। ঝোড়ো হাওয়ায় আগুন কিছুতেই জ্বলে না। শেষে অনেক চেষ্টার পর বাবাজী আগুন জ্বালালেন। যজ্ঞ চলতে থাকে, সেই অবসরে আমি রান্না ঘরে ঢুকে পেটের জ্বালা নিবারণের কাজে ব্যস্ত থাকি।

বেলা ২টার সময় যজ্ঞ শেষ হলে মাথায় নারকেল নিয়ে সরোবরে বিসর্জন দিয়ে আসি। তারপর যাত্রা শুরু হয়। অনেকেই বাসের জানলা দিয়ে শেষ বারের মত মানস সরোবরকে দেখার চেষ্টা করেন কিন্তু আমি দেখি না। কারণ মনে যে মানস সরোবরের ছবি গেঁথে নিয়ে চলেছি তা কোনদিন ফিকে হবার নয়।

রাবণ হ্রদের তীর দিয়ে বাস চলতে থাকে। এখন আর রাবণ হ্রদের জল শান্ত নয়, গাঢ় নীল জলে সমুদ্রের মত ঢেউ। ক্রমে গুরলা পাসও কয়েকটি তিব্বতী গ্রাম পার হয়ে বিকালে বাস তাকলা-কোটের পুলান রেষ্ট হাউসে প্রবেশ করে।

আগের ঘরটিতে পাঁচজনে গিয়ে ঢুকি। ঢালিকে পেয়ে ভট্চাযের কথা আর ফুরোয়না। কৈলাস যাত্রার আগে তিনি যে রকম চটে ছিলেন এখন সে ভাবটা নেই দেখতে পাই। সব চেয়ে খুশী দেখা যায় ঘোষদাকে। কৈলাস যাত্রায় তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল, সেই আশা পূর্ণ হওয়ায় চোখে মুখে তৃপ্তির ছাপ। আমাকে ডেকে বলেন—"ভাই তুমি যে কৈলাস দর্শন করে এসেছ, তার জন্য আমি খুব খুশী হয়েছি।"

রাত্রে ডাইনিং হলে স্বামিজী আবার নির্দ্ধারিত তারিখের দুদিন আগে তিব্বত ছেড়ে ভারতে প্রবেশ করার জন্য প্রস্তাব করেন। কারণ হিসাবে তিনি বলেন, সেপ্টেম্বর মাস শেষ হতে চললো, তিব্বতে যে কোনদিন বরফপাত শুরু হতে পারে ফলে লিপুলেক পার হওয়া

কঠিন হবে। ঘোষদা স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করেন দুদিন আগে গেলে লিপুলেকে চড়ার জন্য ঘোড়া পাওয়া যাবে কি না? উত্তরে স্বামিজী জানান—ঘোড়া পাওয়া যাবে না এবং মালপত্র লিপুলেকে পড়ে থাকবে। কবে দিল্লী পেঁছাবে তা তিনি বলতে পারেন না। এই কথা শোনার পর কোন যাত্রী আর দুদিন আগে যেতে রাজী হলেন না। স্বামিজীর প্রস্তাবে দলনেতা মানিন্দার সিং এর সমর্থন থাকলেও তিনি বাধ্য হয়ে ঘোষণা করলেন যে, নির্দ্ধারিত সূচী-অনুসারে ভারতে প্রবেশ করা হবে।

ঘরে ফিরে সকলের সাথে দুদিন আগে ভারতে ফেরা নিয়ে আলোচনা করি। ভট্চাষদা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে স্বামিজীর তাড়াতাড়ি ভারতে ফেরার কারণ হিসেবে যে কথাগুলি বলেন, সেসব এখানে না বলাই ভাল। আমি জোর দিয়ে বলি, "তাকলাকোটে এখন বরফ পড়তেই পারে না, কারণ আজ বিকালে এখানে আমি অনেক চড়াই পাখি দেখেছি।" আমার ঐ কথা বলার কারণ এই যে, যে সব জায়গায় শীতকালে বরফ পড়ে সেই স্থানের পাখিগুলি বরফ পড়ার ১৫ দিন আগে যে কোন উপায়ে বুঝতে পারে এবং ঐ স্থান ত্যাগ করে। অতএব কোন স্থানে পাখি দেখা গেলে বুঝতে হবে আগামী ১০।১৫ দিনের মধ্যে সেস্থানে বরফ পড়ার সম্ভাবনা নেই।

ঘোষদার কাছে তাঁর কৈলাস পরিক্রমার ঘটনাটি শুনি। পরিক্রমা কালে ১নং দলের দলনেতা ঘোষদাকে সকলের জন্য চাও রান্না করিয়েছেন। পরে ডোলমা পাশের উপর পেঁছে সেই দলনেতা ঘোষদার পা জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং নিজ কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চান। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনোভাবের পরিবর্তন হয় এবং ইয়াকে না চেপে হেঁটে ডোলমা পাশ থেকে নামার জন্য ঘোষদাকে নির্দেশ দেন। হাঁটতে অপারগ ঘোষদা সেইখানেই বসে পড়েন। দলনেতা ঘোষদাকে ফেলে সকলকে নিয়ে এক মাইল এগিয়ে যান। ভট্চাষদা তখন নিরুপায় হয়ে সেই দলনেতার পা জড়িয়ে ধরে অনুরোধ করেন যে সকলে একটু অপেক্ষা করুন; এভাবে ঘোষদাকে

একা ফেলে চলে গেলে উনি নিশ্চয়ই মারা পড়বেন। এরপর ভট্চাযদা নিজে একটা ইয়াক নিয়ে গিয়ে ঘোষদাকে এক মাইল দূর থেকে নিয়ে আসেন।

পরদিন সকালে মুখ হাত ধুয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে তৈরী হয়েনি। আজ যাত্রীদের খেচরনাথ নিয়ে যাওয়া হবে। খেচরনাথ জায়গাটি তাকলাকোট থেকে দক্ষিণ পূর্বদিকে, তিব্বত-নেপাল সীমানার কাছে, যেখানে কর্ণালী নদী নেপালে প্রবেশ করেছে সেখানে অবস্থিত। দূরত্ব ১৫ কিমি। তিব্বতে যে প্রধান চারটি দর্শনীয় স্থান আছে, খেচরনাথ তার মধ্যে একটি। অন্যগুলি হোল কৈলাস-মানস সরোবর ও তীর্থপুরী। তীর্থপুরী দারচিনের ৯০ কিমি পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। পূর্বে এই স্থানে একটি গোম্ফায় হরপার্বতীর মূর্ত্তি ছিল। ত্রেতা পুরীও বলা হয়।

বেলা সাড়ে ৯টা নাগাদ একটি খোলা ট্রাকে খেচরনাথ যাত্রা শুরু হল। প্রথমে খানিকটা সমতল পথ পার হবার পর ট্রাক কর্ণালী নদীর মধ্যে নেমেই নদী পার হল। তারপর আরম্ভ হল ভীষণ উঁচু-নীচু পথ। একে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস, তার উপর ট্রাক এত হেলেদুলে চলেছে যে বসে থাকা খুব কষ্টকর। পথে এক প্রকার সরু পাতাওলা ইউক্যালিপটাস জাতীয় গাছের আধিক্য দেখা যায়। এত গাছ এ অঞ্চলে আর কোথায় চোখে পড়েনি। ঘণ্টা খানেক এইভাবে চলার পর খেচরনাথ গ্রামে পৌঁছে ট্রাক দাঁড়িয়ে পড়ল।

খেচরনাথ নামটির মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকে অনেক রকম বলেন। আসল নামটি সম্ভবত 'কোজর জো'। তিব্বতী-ভাষায় কোজর শব্দের অর্থ ধনুর্বাণ এবং জো শব্দের অর্থ দেবতা। কোজর জো মন্দিরের ভিতরে যে তিনটি মূর্তি আছে তার মধ্যে দুটি মূর্তির হাতে পূর্বে ধনুর্বাণ ছিল এবং এই মূর্তি তিনটি রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার মূর্তি বলে মনে করা হয়। সেই হিসাবে ধরতে গেল কোজর জো নামটির সার্থকতা বেশী। চীনা কর্তৃপক্ষের দেওয়া মানচিত্রে জায়গাটির নাম দেওয়া আছে কেজিয়া (KEGIA)।

তিব্বতে যতগুলি গ্রাম চোখে পড়েছে তার মধ্যে কোজর জো সবচেয়ে বেশী ঘন বসতিপূর্ণ মনে হল। যেখানে ট্রাক থেকে নামলাম তার বাঁদিকে গলি রাস্তার দুপাশে ঘরবাড়ী। গলির মধ্য দিয়ে কুল-কুল করে জল বয়ে আসছে। সেই জল-প্লাবিত গলি পার হয়ে, কিছুটা আঁকা বাঁকা গলি খুজি পার হয়ে এক সময় একটি উঠানে হাজির হলাম। সামনে কোজর জো মন্দির। ডানদিকে একটি মঠ, বাঁদিকে তিব্বতী গৃহস্থের বাড়ী এবং উঠানের এদিকে সম্ভবত তীর্থ যাত্রীদের থাকার জন্য নিবাস। নিবাসটি এখন বন্ধই রয়েছে।

কোজর জো মন্দিরটি মাটির তৈরী। সামনের থেকে তিনটি স্তর আছে। দ্বিতীয় স্তরে মাঝখানে একটি চূঁড়া মত এবং দুপাশে দুটি হরিণের প্রতিমূর্ত্তি। মন্দিরের ডানদিকে একটি ৪০ ফুট লম্বা সাদা কাপড় জড়ানো কাঠের দণ্ড। দণ্ডের মাথা থেকে নীচ অবধি চারিদিকে পতাকার মালা।

মন্দিরের দ্বার বন্ধ। গাইড ওয়াংচু মন্দিরের পূজারীকে খুঁজতে গেলেন। যাত্রীদের দেখে গ্রামের একপাল ছোট ছেলে মেয়ে মন্দিরের সামনে হাজির হয়েছে এবং তাদের সাথে কিছু উৎসাহী অভিভাবকও হাজির। আমি মন্দিরের বাঁদিকের গলি দিয়ে ঢুকে, মন্দির পরিক্রমা করে, ডানদিকের গলি দিয়ে বেরিয়ে এলাম। মন্দিরের পিছনেই কর্ণালী নদী, আর দু-পাশে তিব্বতীদের মাটির বাড়ীগুলি অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন ও খুব ছোট ছোট জানলা দরজা। মন্দির দ্বারের দু'পাশে প্রাচীর গাত্রে কুলুঙ্গীর মধ্যে তিনটি করে চোলকের মত জিনিস লাগান আছে, হাত দিয়ে ঘোরালে বন্‌বন্‌ করে ঘুরতে থাকে।

এক সময় পূজারী এসে হাজির হন। বাংলার গ্রামের লোকের মত একখানা ধুতি অর্দ্ধেক পরা অর্দ্ধেক গায়ে ঢাকা। তালা খোলার পর দরজা দিয়ে ঢুকে সামান্য একটু ঘেরা জায়গা, উপরে ছাউনি নেই। পাশে দু-চারটা পোস্টম্যান মার্কা বাদাম তেলের টিনে দোপাটি ফুলের গাছ। তার পরে মূল মন্দিরের দ্বার। সাত ফুট লম্বা, ছয় ফুট চওড়া সুন্দর কারু কাজ করা কাঠের দরজা। জুতো খুলে মন্দিরে

প্রবেশ করি। ভিতরে ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার। টর্চ জ্বালিয়ে ভিতরটি দেখার চেষ্টা করি। মন্দিরের ভিতরটি প্রায় ২৫ ফুট লম্বা ও ১৭।১৮ ফুট চওড়া। দু-পাশে তিন ফুট চওড়া রাস্তা ও মাঝখানে লামাদের বসার জন্য উঁচু বেদী। বেদীর উপর তিব্বতী কার্পেট পাতা। দরজার বিপরীত দিকে দেওয়ালে বুক সমান বেদীর উপর প্রায় ছয় ফুট লম্বা পাশাপাশি তিনটি মূর্ত্তি। মূর্ত্তি তিনটি ধাতু নির্মিত। তিনটি পদ্মফুলের উপর মূর্ত্তি তিনটি দাঁড়িয়ে। দু'টি মূর্ত্তির, রং হলদেটে একটির সাদা। মুখের গড়ন তিনটি মূর্ত্তির একই রকম। আমাদের দেশে প্রাচীন দুর্গা প্রতিমার মুখ যেমন ঠিক তেমন। মূর্ত্তির মাথার মুকুট তিনটি কিন্তু প্রাচীন গ্রীক দেব-দেবীদের মত। পোষাকও সেইরূপ। মূর্ত্তির হাতে কোন ধনুর্বাণ দেখতে পাওয়া গেল না। কারণ চীনারা সেগুলি ভেঙে নষ্ট করেছে। মূর্ত্তি তিনটির ডান-দিকে একটি ভগবান বুদ্ধের ছবি রয়েছে দেখলাম।

ছবির ডানদিকে একটি ছোট দরজা। দরজা দিয়ে দু-এক জন ঢুকছে দেখে আমিও ঢুকে পড়ি। দরজার পরই আরম্ভ হয়েছে সরু মাটির সিঁড়ি। ভীষণ অন্ধকার, দমবন্ধ করা পরিবেশ। টর্চ জ্বালিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলায় মাটির ঘরে হাজির হই। ছোট ঘর, জানলা-দরজা কিছুই নেই। প্রদীপ হাতে এক লামা যাত্রীদের কোন দেবতা দর্শন করাচ্ছেন। কাছে গিয়ে দেখি ডানদিকে দেওয়ালে কুলুঙ্গীতে একটি ছোট কালীর মূর্ত্তি, মূর্ত্তির পায়ের কাছে একটি ঘোড়ার মুখ। কিছুই বুঝতে পারা গেল না। জিজ্ঞাসা করারও উপায় নেই কারণ লোকটি ভাষা বোঝে না। বেশীক্ষণ থাকারও উপায় নেই, দমবন্ধ হয়ে আসছে। নীচে নেমে এসে রাম লক্ষণও সীতার মূর্ত্তির পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে থাকি। সামনে চমরী গাইয়ের মাখনের প্রদীপ জ্বলছে তাছাড়া মূর্ত্তির মাথার উপর মন্দিরের ছাদ চৌকা মত কাটা থাকার ফলে দিনের আলো এসে মূর্ত্তির মুখমণ্ডলে এসে পড়েছে।

এই কোজর জো মন্দিরের ভিতরে ছবি তোলার বিধি-নিষেধ

আছে। ছবি তুলতে হলে ক্যামেরা পিছু ৪০ য়ুয়ান মন্দিরের লামাকে দিতে হয়। দেব মূর্ত্তি দর্শন করতে হলেও যাত্রী পিছু ১০ য়ুয়ান দিতে হয়। তবে যাত্রীদের দর্শনী চীনা কতৃপক্ষই দিয়েছিলেন।

মন্দিরের ভিতর বাঁদিকে র‍্যাকে অনেক তিব্বতী গ্রন্থ রয়েছে। ডানদিকে ছাতুর ডেক্‌চি ও চায়ের সরঞ্জাম। চা ও ছাতু ছাড়া এখানে কোন পুজো হয় না। এক সময় দর্শন শেষ করে বাইরে আসি। এরপর মন্দিরের ডানদিকে পূর্বে যে মঠের কথা বলেছি, সেই মঠে প্রবেশ করি। মঠটি একটি ছোট খাট সিনেমা হলের মত। প্রথম দরজার পরে আর একটি সুন্দর কাঠের কাজ করা দরজা। লামা দেখান—দরজার বাজুর অর্দ্ধেকটা চীনারা ভেঙে দিয়েছিল, সেটি আবার নতুন করে তৈরী করা হয়েছে। একই নক্‌শা কিন্তু বাজুর উপরটি হাজার বছরের পুরাতন, নীচেরটি নতুন।

হলঘরে প্রবেশ করি। হলের মাঝখানে একটি বড় টেবিলে অনেক জিনিসপত্র রয়েছে। সিলিংয়ে খুব সুন্দর তৈলচিত্র অঙ্কিত। হলের মেঝে মাটির, প্রচুর ধুলো। দেওয়ালে তিব্বতী জীব-জন্তুর চামড়া ও মুখ টাঙানো। হলের পিছনের দিকে একটি করে প্রায় ১২ ফুট লম্বা ও ৮ ফুট চওড়া এক বিরাট তৈলচিত্র। এক মুণ্ডিত মস্তক, গেরুয়াবসন বৌদ্ধ সন্যাসীর প্রতিকৃতি। ছবিটি কার? একথা জিজ্ঞাসা করায় লামা যে তিব্বতী নামটি বললেন তা ঠিক বোঝা গেল না। তবে আমার মনে হয় তৈলচিত্রটি অতীশ দীপঙ্করের। কারণ অতীশ দীপঙ্কর যখন তিব্বতে গিয়েছিলেন, তখন নেপালের মুক্তিনাথ হ'য়ে কোজর জো গ্রামেই প্রথমে উঠেছিলেন। তাই চিত্রটি অতীশ দীপঙ্করের হওয়াই স্বাভাবিক। এই মঠে অতীশ দীপঙ্কর এক বৎসর বাস করেছিলেন বলেও তিব্বতীরা বলে থাকেন। বৌদ্ধ সন্যাসীর দু'-হাতের মুদ্রা অতীশ দীপঙ্করের মত। যাইহোক লামার পাশে রাখা আশীর্বাদী ভস্ম কপালে ঠেকিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসি।

মন্দির প্রাঙ্গনে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করি পাশের একটি বাড়ীর ছাদ

থেকে এক চীনা তরুণী যাত্রীদের গতিবিধির উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে। ওদের কাজই হ'চ্ছে ভারতীয় তীর্থযাত্রীদের উপর লক্ষ্য রাখা। ট্রাকে উঠে বসি। সামনে পাহাড়ের নীচে গ্রামবাসীদের গম ঝাড়াইয়ের কাজ চলছে। তিব্বতে ঘোড়া ও ইয়াক দ্বারা কলুর বলদের মত ঘুরে ঘুরে গম মাড়াই করা হয়। বাতাসে এত গমের খোসার গুঁড়ো উড়ছে যে চোখ খুলে রাখা যায় না। পূর্বের পথ ধরে আবার রেষ্ট হাউসে ফিরে আসি। রেষ্ট হাউসে পৌঁছেই দলনেতা মানিন্দার ঘোষণা করলেন যে, কোজর-জো মন্দিরের লামা, যাত্রীদের সমস্ত বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করার জন্য, কতগুলি মন্ত্রপূত দ্রব্য দিয়েছেন। বলে কি? সমস্ত বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা! সামনে এখনও লিপুলেক পাস বাকী! ব্যাস আর বলতে হয় না, ৩৫ জন যাত্রী এক সাথে ঝাঁপিয়ে পড়েন সেই মন্ত্রপূতঃ দ্রব্য সংগ্রহ করার জন্য। আমি নিজেও অতিকষ্টে একটি সংগ্রহ করি। মন্ত্র-তন্ত্র ও ঝাড়ফুকের ব্যাপারে তিব্বতীরা সারা পৃথিবীর গুরু। তাই মন্ত্রপূতঃ দ্রব্যটি কাছে রেখে মনে অনেকটা জোর পাই।

দুপুরে যাত্রীদের বাসে করে স্থানীয় তিব্বতী বাজারে নিয়ে যাওয়া হল। বাজার রেষ্ট হাউস থেকে ৩ কিমি দূর। কর্ণালী নদীর এপারে বাজার, ওপারে পুরাং পাহাড়ের নীচে নেপালী উল মণ্ডি। নদী পারাপারের জন্য সরু কাঠের পুল আছে। পুরাং পাহাড়ের মাথার অতীতের শিম্পিলিং গোম্ফার ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। অতীতে প্রতি বছর ১০ই শ্রাবণ তারিখে শিম্পিলিং গোম্ফায় একটি উৎসব হত এবং মেলা বসত কিন্তু এখন আর কিছুই নেই।

মাটির প্রাচীর দিয়ে ঘেরা অনেকটা জায়গার মধ্যে বাজার, দরজা দিয়ে ঢুকে সামনেই একটা লম্বা মাটির ঘরে বড় ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর। দোকানটিতে খাবার জিনিস বাদ দিয়ে জামা-কাপড় থেকে আরম্ভ করে ছাতা, জুতো, লোহার সামগ্রী কাঠের জিনিস ইত্যাদি সংসারের কাজে লাগে এমন সবই পাওয়া যায়। আমার ইচ্ছা ছিল একটা ছাতা কেনার। দোকানদারকে দাম জিজ্ঞাসা করায় চীনা

ভাষায় তিনি যা বললেন তার অর্থ হল—ভারতের তৈরী ছাতা কিনে ভারতে বয়ে নিয়ে গিয়ে লাভ কি? কথাটা শুনে খুবই আশ্চর্য হয়েছিলাম। ঐ দোকান থেকে বেরিয়ে অন্য দোকানগুলি দেখতে যাই। ঘেরা জায়গার ভিতরে একটি রাস্তা আছে, রাস্তার ডানদিকে কয়েকটি দোকান। প্রথম দোকানটি মুদিখানার, দ্বিতীয় দোকানটি তৈরী খাবারের, তৃতীয় দোকানটিতে তৈরী পোষাক ও বাসনপত্র পাওয়া যায়! শেষের দোকানটি আধুনিক ডিজাইনের, সামনে রোলিং সাটার লাগান, বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স জিনিস ও বিলাস সামগ্রী পাওয়া যায়। যাত্রীরা অনেকে কিছু কিছু জিনিসপত্র কিনলেন। আমি তিনটি চীনা বাটি কিনলাম, দাম তিন য়ুয়ান। বাজার দেখা শেষ করে চীনা সময় সাড়ে ছ'টায় রেষ্ট হাউসে ফিরে এলাম।

সন্ধ্যাবেলা ঘরে পাঁচজনে জমিয়ে গল্প চলে। কৈলাস যাত্রার আগে যে মানবিক চাপ ছিল, এখন আর সেটি নেই। সকলের মন খুব হালকা। মুখার্জীদা ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনীর জন্য জামা-কাপড়, বিছানার চাদর, বালিসের ঢাকা, বন্ধু-বান্ধবের জন্যে উপহার সামগ্রী ইত্যাদি বহু জিনিস কিনেছেন। আজ ৫ই আশ্বিন, মহালয়া। আমি মন্তব্য করি—দাদা, এবারের পুজোর বাজারটা চীনেই করলেন। পুজোর কথা শুনে সকলের মন একটু উদাস হয় কিন্তু মুখে কেউ কিছু প্রকাশ করেন না।

রাত্রে খাওয়ার পর ডাইনিং হলে ভিডিওতে একটি চীনা ছবি শুরু হল। যা কিড়িং মিড়িং ভাষা, দশ মিনিট দেখার পরে মাথা ধরে যাওয়ার ফলে ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম। তিব্বতে যাওয়ার আগে বইয়ে পড়েছিলাম যে রাত্রে তিব্বতের আকাশে তারাগুলি টর্চের মত জ্বলে। ব্যাপারটা সত্যি কিনা দেখার জন্য রাত্রে অনেক বার বাইরে বেরিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেছি। তিব্বত জায়গাটা ১৫,০০০ ফুট উঁচু এবং বাতাসে ধুলো ধোঁয়া না থাকার ফলে আমাদের দেশের তুলনায় তারাগুলি অনেক উজ্জ্বল ও পরিষ্কার দেখায় ঠিকই হবে টর্চের আলোয় মত কখনই নয়।

রাত পুইয়ে সকাল হয়। তিব্বতে শেষ দিন। সকালের দিকে যাত্রীরা রেষ্ট-হাউসের ভিতরে দোকানটিতে শেষ মুহূর্তের কেনাকাটা সেরে নেন। এখানেরও দোকানগুলিতে দেখেছি আমাদের দেশের তুলনায় জিনিসের দাম অনেক বেশী। সস্তা একমাত্র মদ ও সিগারেটের। আমাদের দেশে এক লিটার কেরোসিন আড়াই টাকা এখানে দশ টাকা। দিল্লীতে একটি সোয়েটার কিনেছিলাম ৫৫ টাকায়, সে রকম সোয়েটার এখানে ১৪০ টাকা। ক্যামেরার ফিল্ম ভারতে ৪৫ টাকা, এখানে ১০০ টাকা। একটা ডট্ পেন ১৪ টাকা। পার্থক্য অনেক।

দুপুরে যাত্রীদের অবশিষ্ট য়ুয়ান নিয়ে তার বিনিময়ে ডলার দেওয়া হল এই সময় কোন ব্যক্তিকে চীনা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কমিশন নিতে দেখলাম। পরিক্রমা বাবদ ঘোড়া ও ইয়াকের ভাড়া চীনা কর্তৃপক্ষ প্রথমেই নিয়ে নেয় একথা আগেই বলেছি, যাত্রী পরিক্রমায় না গেলে নেয়া অগ্রিম অর্থ চীনা কর্তৃপক্ষ কিছুটা ফেরত দেয়, এটা সকলের জানার কথা নয়। যিনি জানতেন তিনি অর্থটা নিজের পকেটে ঢোকালেন।

বিকেলে পাশপোর্ট ও ভিসা চেকিং শেষ হল। কাস্টম চেকিং এর জন্য প্রত্যেক যাত্রীকে চীনা কর্তৃপক্ষের কাছে ১ য়ুয়ান জমা দিতে হল। মালপত্র খানাতল্লাসী করার পর চীনা কর্তৃপক্ষের কাছে জমা রইল। হাত ব্যাগগুলি কেবল যাত্রীদের কাছে রইল।

কথাছিল ভারতীয় যাত্রীরা রাত্রে এক বড় ভোজের আয়োজন করবে এবং রেষ্ট-হাউসের চীনা কর্মীদের সেই ভোজে আপ্যায়িত করবে। কিন্তু খাওয়ার সময় দেখা গেল, দিল্লীর দুই যুবক, যাদের উপর রান্নার ভারছিল—তারা খিচুড়ি এমন পুড়িয়ে ফেলছেন যে, চীনারা তো দূরের কথা ভারতীয় যাত্রীরাও কেউ কিছু মুখে দিতে পারলেন না। দুটি করে গুলাব জামুন খেয়ে সকলকে সন্তুষ্ট থাকতে হল। এরপর যাত্রীদের তরফ থেকে চীনা কর্মীদের সামান্য কিছু কিছু উপহার দেওয়া হল। তারপর ডাইনিং হলে শুরু হল একটি ছোট অনুষ্ঠান। ভট্চাযদার শ্যামা সঙ্গীত, পাণ্ডেদার উর্দু কবিতা,

কাভিকারের মীরার ভজন, বাবাজী ও শেঠজীর কৈলাস সম্পর্কে আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি জমে উঠল। রাত ১০টায় অনুষ্ঠান শেষে কর্মীদের সাথে করমর্দন করে যাত্রীরা নিজের নিজের ঘরে ফিরলেন।

কখন তিনটা বাজে এই চিন্তায় রাত্রে ভালো ঘুম হয় না। তিনটে বাজলেই উঠে পড়ি। সাড়ে তিনটায় ব্রেকফাস্ট সেরে চারটায় বাসে উঠে বসি। ১১ই সেপ্টেম্বর এই পুলান রেষ্ট হাউসে এসে উঠেছিলাম, আজ ২৪শে সেপ্টেম্বর পুলান ত্যাগ করে ভারতে ফিরে চলেছি। বাস ছাড়ার মুহূর্তে সবাই হাজির কিন্তু ঘোষদাকে দেখতে পাওয়া যায় না। চারিদিকে খোঁজাখুঁজি চলে। কিছু পরে দু'জন যাত্রী গিয়ে ঘোষদাকে নিয়ে আসে। শুনতে পাই, কেউ কিছু ফেলে এল কিনা সেই খোঁজে ঘোষদা ব্যস্ত ছিলেন।

'ওঁ নমঃ শিবায়' ধ্বনির মধ্যে বাস ছাড়ে। অন্ধকারের মধ্যে হেড লাইট জেবলে সেই আগের রাস্তায় বাস চলতে থাকে। আসার সময় যেখানে বাসে চেপেছিলাম, সেখানে পেঁছিবার পর দিনের আলো ফোটে। পুল পার হয়ে কাঁপতে কাঁপতে ট্রাকে উঠে বসি। আবহাওয়া আজ ভালই রয়েছে। গত দুদিন আগে লিপুলেক পাশের উপর মেঘ জমে অন্ধকার মত হয়েছিল। পুলান রেষ্ট হাউস থেকে সেই দৃশ্য দেখে অনেকেই আশঙ্কিত হয়েছিলেন কিন্তু এখন সে ভাবনা দূর হয়। বেশ কিছুদূর চলার পর ট্রাক দাঁড়িয়ে পড়ে। সেখানে অনেক ঘোড়া নিয়ে চীনা ও তিব্বতী সহিসরা দাঁড়িয়ে। একটি ঘোড়ায় উঠে পড়ি। তারপর সারি বদ্ধভাবে লিপুলেক পাশের উদ্দেশ্যে ঘোড়গুলির যাত্রা শুরু হয়। ভাগ্যক্রমে আমার ঘোড়াটি আমার মতই দুর্বল। সামান্য চলে আবার দু-চার মিনিট বিশ্রাম নেয়। এই ঠাণ্ডায় ঘোড়ার পিঠে বসে থাকা খুবই কষ্টকর। হাত-পা ও হাঁটুর উপরটা ঠাণ্ডায় অবশ হয়ে ঝিমঝিম করতে শুরু করে।

চলতে চলতে এক সময় লিপুলেক পাশের নীচে পেঁছে ঘোড়া

গুলি দাঁড়িয়ে পড়ে। তিব্বতে প্রবেশ করার সময় যে বরফ দেখেছিলাম, এখন সামান্য বেশী মনে হল। এখন ঘোড়া থেকে নেমে বাসের মাথায় উঠতে হবে। কিন্তু ঘোড়া থেকে নেমে বরফের উপর দাঁড়াতেই প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে গেল। শ্বাসকষ্ট নিবারণের জন্য যে এক পুরিয়া ওষুধ অবশিষ্ট ছিল, সেটি খাওয়ার কিছু পরে শ্বাসকষ্ট কিছুটা কম হলে সঙ্গের চীনা সহিসটিকে হাত ধরে পথের উপর পেঁছে দিতে ইশারা করি। একে খাড়া চড়াই তার উপর হাঁটু ডুবে যাওয়া বরফ। বলতে গেলে চীনা সহিসটি আমাকে হড় হড় করে টেনে পাসের মাথায় পেঁছে দেয়। পাসের উপর স্বামিজী ও অন্য দু'একজন যাত্রীকে মাত্র দেখতে পাই। সঙ্গে আসা চীনা সহিসটিকে বুকে জড়িয়ে ধরি, ভাষা বোঝে না তাই চোখের ভাষায় মনের কৃতজ্ঞতা জানাই। এখন সকাল সাড়ে সাতটা। লিপুলেক পাসের এবং লিপুলেক পাস থেকে ভারতের দুটি ফটো তুলে ভারতের দিকে নামতে উদ্যত হই। যাত্রীদের নিয়ে যাওয়ার জন্য ভারতের দিক থেকে অনেক ঘোড়া ও কুলি পাসের মাথায় ও নীচে হাজির হয়েছে। স্বামিজী নামতে বাধা দিয়ে বলেন—আগে নিজের মালপত্র পাসের মাথায় এসেছে কিনা দেখে, তারপর নীচে নামবে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর মালপত্র এসে যায়। নিজের নাম লেখা দুটি ব্যাগ এসে গেছে দেখে ভারতের দিকে নামতে শুরু করি। যতদূর দৃষ্টি চলে সাদা বরফে ঢাকা উৎরাই। পথের কোন চিহ্ন নেই, মালপত্র নিতে আসা ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন ধরে আমিই প্রথম নেমে চলেছি। পথের পাশে কিছুটা ব্যবধানে একটি করে অক্সিজেনে সিলিণ্ডার পড়ে রয়েছে। এখানে ওখানে অনেক সামরিক কর্মী দাঁড়িয়ে প্রত্যেক যাত্রীর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছেন, যেন কারো কোন বিপদ না ঘটে। সামনে একটি পাথরের উপর বর্ডার পুলিসের সেই তরুণ ডাক্তার দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কাছে গিয়ে ডাক্তারকে বুকে জড়িয়ে ধরি। ডাক্তার কুশল জিজ্ঞাসা করার পর বলেন—"যাবার

সময় আপনাকে বলেছিলাম, ফেরার সময় এখানেই আবার রিসিভ করবও সে কথা মনে আছে ?

হেসে বলি—মনে আছে। ডাক্তার বলেন—আপনি নাবিডাং-এ চলুন, সব যাত্রীকে পার করে আমি পরে আসছি।

নাবিডাং-এর দিকে নেমে চলি। যাবার সময় যে পথ সাড়ে তিন ঘণ্টা লেগেছিল এখন দু'ঘণ্টায় সেই পথ নেমে নাবিডাং-এ পেঁছে গেলাম। নাবিডাং-এ এখন আর কোন তাঁবু নেই, কেবল একটি টেবিলে চা, জলখাবার সাজিয়ে কুমায়ুন নিগমের কর্মীরা দাঁড়িয়ে আছেন। এটি বছরের শেষ দল, আর কোন যাত্রী এখানে আসবেন না। আকাশ পরিষ্কার। সামনে ওঁ পর্বতের একটি ছবি তুলি।

যাওয়ার সময় নাবিডাং-এ রাত্রিবাস করতে হয়েছিল কিন্তু ফেরার সময় আরও নয় কিমি নেমে কালাপানিতে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বেশী সময় নষ্ট না করে কালাপানির দিকে নেমে চলি।

মাইলখানেক নামার পর দু'পায়ের বুড়ো আঙুল দুটিতে প্রচণ্ড বেদনা আরম্ভ হয়ে গেল। পায়ে চাইনিজ-কেডস্ জুতো ছিল, পা ডুবে যাওয়া বরফে জুতো ভিজে যাওয়াতে হোক কিম্বা বরফের নীচে পাথরে আঘাত লেগেই হোক—দুই আঙুলে এত যন্ত্রণা যে হেঁটে চলা খুবই কষ্ট কর হয়ে পড়ল। সকলের প্রথমে হাঁটা শুরু করে সকলের শেষে বেলা আড়াইটার সময় কালাপানিতে পেঁছিলাম। ভেবেছিলাম কালাপানিতে ডাক্তারকে পায়ের অবস্থা দেখিয়ে ওষুধ নেব। কিন্তু শুনতে পেলাম, স্বামিজীর হুকুম হয়েছে।

কালাপানিতে রাত্রিবাস না করে আরও দশ কিমি নেমে গিয়ে গুঞ্জিতে আজকের যাত্রা শেষ হবে। অর্দ্ধেকের বেশী যাত্রী স্বামিজীর এ প্রস্তাবে বিরোধিতা করলেও আমি নিজে ভালোভাবে জানতাম যে স্বামিজীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। আর কি করি ? মানিন্দারের কাছে গিয়ে পায়ের অবস্থা জানিয়ে পরিষ্কার করে বলি যে, ঘোড়া ছাড়া হেঁটে গুঞ্জি যাওয়া আমার পক্ষে কোন মতেই সম্ভব নয়। মানিন্দার আমার অবস্থা বুঝে একটি ঘোড়ার ব্যবস্থা করে দেন। সেই ঘোড়ায়

চেপে সন্ধ্যে ছয়টার সময় গুঞ্জি রেস্ট হাউসে পেঁছাই।

লিপুলেক থেকে নামার সময় দু-দিনের পথ একদিনে নামতে হবে। এটা সরকারী ভাবে ঠিক করা আছে, ভাল কথা কিন্তু বেসরকারী ভাবে তিন দিনের পথ একদিনে করা হল কেন তা বলতে পারব না। যাওয়ার পথে দশ দিন এবং আসার পথে ৮ দিন, এই ১৮ দিনের থাকা-খাওয়া ও মাল পরিবহন ব্যয় বাবদ প্রত্যেক যাত্রীকে ৩০০০ টাকা কুমায়ুন মণ্ডল নিগমকে দিতে হয়েছিল। ১৮ দিনের মধ্যে একদিন কমিয়ে দিতে পারলে নিগমের যে ৬ হাজার টাকা বেঁচে যায় তার জন্য কাউকে কোন কমিশন দেওয়া হয় কিনা সেকথা আমি বলতে পারব না।

গুঞ্জিতে পেঁছেই জুতো মোজা খুলে পায়ের অবস্থা দেখি। দেখা যায় দু-পায়ের বুড়ো আঙুল দুটি ভীষণ ভাবে ফুলে কালিবর্ণ ধারণ করেছে এবং হাত দেওয়া যায় না এত ব্যাথা। দেরী না করে ডাক্তারকে পায়ের অবস্থা দেখাই। ডাক্তার পা দুটি দেখেই দৌড়ে পাশ্ববর্তী বর্ডার পুলিসের ক্যাম্পে চলে যান এবং দু-মিনিট পরেই সহকারীর হাতে তিনটি ট্যাবলেট পাঠিয়ে দেন। পরে ডাক্তার আমার সাথে দেখা করে বলেছিলেন যে সময় মত ওষুধ না পড়লে পা দুটির ভীষণ ক্ষতি হয়ে যেতে পারত। এই প্রসঙ্গে পাঠককে জানিয়ে রাখি, বরফে হাঁটতে হলে কখনই কাপড়ের জুতো পরা উচিত নয় এবং মোজা পরার আগে দুপায়ে বেশ করে পাউডার লাগিয়ে তবে মোজা জুতো পরা উচিত। এর ফলে বহু রকম ক্ষতির হাত থেকে পা দুটিকে রক্ষা করা যায়। আমি নিজে প্রথম থেকেই ওয়াটার প্রুফ জুতো পায়ে দিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলাম কিন্তু স্বামিজীর পরামর্শে কাপড়ের জুতো পরে আজ এই ভোগান্তি।

পরের দিন খুব ভোরে রওনা হবার আগে স্বামিজী, বাবাজী, শেঠজী ও ডাক্তার শুক্লা চার জনে বদ্রীনাথের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। পাণ্ডেদাও টনকপুর যাওয়ার জন্য বিদায় নিলেন। দলে পাঁচজন যাত্রী কমে গেলেন।

গুঞ্জিত থেকে সতের কিমি পথ নেমে এসে বুদিতে রাত্রিবাস। ফেরার পথে মালপা থেকে গলাগড় আসার পথে বিন্ধ্যাকোটির চড়াইয়ে উঠতে প্রচণ্ড কষ্ট পেয়েছিলাম। একে পাহাড়ের গা বেয়ে বুক ভাঙা চড়াই তার উপর গোটা পথটিকে কোথাও গাছের ছায়া ও জল নেই। ফেরার পথে এই অংশটি অতিক্রম করতে যাত্রীদের সবচেয়ে বেশী কষ্ট হয়।

গলগড়ে যে ঘরটিতে ছিলাম, সেই ঘরে সন্ধ্যাবেলা গানের আসর বসে যায়। ভট্চাযদার শ্যামা সঙ্গীত তো আছেই, ঘোষদার নিয়ে যাওয়া হিন্দী-বাংলা ভজন গানের ক্যাসেটগুলি সন্ধ্যায় আনন্দময় করে তোলে। ঘোড়ার সহিসরা দু-একজন স্থানীয় ভাষায় কয়েকটি গান গেয়ে শোনায়। গলাঁগড় গ্রামের কয়েকজন মহিলাও গানের আসরে যোগদান করেন। সবচেয়ে ভাল লাগে ১২।১৩ বছরের একটি ছেলের গান। স্থানীয় রং বুলি ভাষায় গাওয়া "গঙ্গা কী ঠাণ্ডা পানি, ঠাণ্ডি হো ছাঁও···"। গানটির সুর অপূর্ব। যাত্রীদের মধ্যে যাঁরা গানটি শুনেছিলেন, জীবনে কোন দিন ভুলতে পারবেন না। এখানে গঙ্গা বলতে কালী গঙ্গার কথা বলা হয়েছে।

যেদিন শিরখা পেঁীছাই, সেদিন রাত্রে ক্যাম্প ফায়ারের আয়োজন করা হয়। যাত্রীদের অপেক্ষা নিগমের কর্মচারীদের উৎসাহ বেশী দেখা যায়। এর কারণ, এই সব কর্মীরা যাত্রীদের সেবা করার জন্য গত চার মাস যাবৎ বাড়ীঘর ছেড়ে এই পাহাড়ে পড়ে আছেন। পরের দিন যাত্রীদের সাথে তারাও নীচে নেমে যাবেন এবং নিজের ঘরে ফিরে যাবেন। হাল-আমলে কৈলাস যাত্রা আরম্ভ হওয়ার পর কুমায়ুনের চৌদাসও বিয়াস পট্টির অর্থনৈতিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। পথের ধারের দোকানগুলির বেচাকেনা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কমপক্ষে ৫00 লোকের চার মাসের কর্ম সংস্থান হয়েছে। রাস্তাগুলিরও ভালভাবে রক্ষনাবেক্ষণ হচ্ছে। ভারত সরকার যা কিছু ব্যবস্থা করেছেন তার মধ্যে স্থানীয় লোকজনই নিয়োজিত আছেন।

পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে, কৈলাস যাবার সময় পদ যাত্রার প্রথম

দিনে সোসায় রাত্রিবাস করতে হয়েছিল। কিন্তু ফেরার সময় সোসায় রাত্রিবাসের কোন ব্যবস্থা নেই। শিরখা থেকে ১৯ কিমি নেমে তাওয়াঘাটে পেঁছে সেখান থেকে বাস যোগে ধারচুলা পেঁছাবার কথা। একটা কথা বলা হয়নি। ফেরার পথে শিরখা পেঁছে, শিরখা গ্রামটিকে আর চেনা যাচ্ছিল না। সমস্ত বাড়ীঘর নতুন রং করা হয়েছে, গ্রামটিকে সুন্দর করে উৎসবের সাজে সাজানো হয়েছে। গ্রামের মধ্যে এবং দূর-দূরান্ত থেকে বাজনার আওয়াজ ভেসে আসছে। গ্রামবাসীদের মধ্যে সাজো সাজো রব পড়ে গেছে। গ্রামের প্রবীণ এক দোকানদারের কাছে জানতে পারা গেল যে দুদিন পরে শিরখা গ্রামের নীচে এই অঞ্চলের একটি বড় উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। উৎসবটি এই রকম ঃ—শিরথা গ্রামের কিছুটা নীচে কোন জায়গায় একটি মাত্র বিশেষ গাছ জন্মায় এবং আশ্চর্যের কথা সেই গাছে ১২ বৎসর অন্তর ফুল ফোটে। এই বৎসর সেই গাছে ফুল ফুটেছে তাই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। উৎসবের দিনের চৌদাস পট্টির (থানিধর থেকে রুংলিং পাসের নীচ পর্যন্ত অঞ্চল) সমস্ত গ্রামের গ্রামবাসীরা সেজে গুজে শোভাযাত্রা করে সেই বিশেষ গাছের চারিদিকে জড়ো হয়। সারাদিন নৃত্য-গীত আনন্দ চলার পর সমবেত মহিলারা সেই গাছটিকে ধ্বংস করে দেয়। তারপর সবাই ঘরে ফিরে আসে। শুনে অবাক হতে হয় যে গাছটিকে ধ্বংস করা হলেও কিছুদিন বাদে আবার একটি গাছের জন্ম হয় এবং ১২ বছর বাদে সেই গাছে আবার ফুল ফোটে। তখন আবার উৎসবের আয়োজন করা হয়। দোকানদার ভদ্রলোক জানালেন, তিনি শৈশব থেকে দেখে আসছেন একই ভাবে উৎসব চলে আসছে।

পরেরদিন ২৯শে সেপ্টেম্বর, দুর্গাপুজার সপ্তমী। পদযাত্রার শেষ দিন বলে যাত্রীদের চোখে মুখে আনন্দের আভাষ। পাঠকের হয়ত স্মরণ আছে, কৈলাস যাওয়ার সময় সোসা থেকে নারায়ণ আশ্রম হয়ে শিরখা আসা হয়েছিল কিন্তু ফেরার সময় অন্য পথে সোসা হয়ে তাওয়াঘাটে নামতে হবে।

খুব ভোরে উঠে ব্রেকফাষ্ট সেরে যখন যাত্রা শুরু করি, তখন শিরখা গ্রামের অনেকেরই ঘুম ভাঙেনি। শিরখা পার হয়ে এক বিরাট চড়াই বেয়ে উঠে চলেছি। সঙ্গে ভট্চাযদা ও ঢালিদা। পথের পাশে আপেল গাছ লাল আপেলের ভারে নুয়ে পড়েছে। পাশে পাথরের ছোট ঘর। ভট্চাযদার কি খেয়াল হয়, সেই ঘরের দরজায় গিয়ে ধাক্কাধাক্কি শুরু করেন। একটি পাহাড়ী লোক দরজা খুলে ঘুম জড়ানো চক্ষে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। ভট্চাযদা সটান ঘরে ঢুকে পড়ে বলেন "আপেল চাই।"

"দু-টাকা কিলো"—লোকটি বলে! ভট্চাযটা বলেন "পয়সা নেই। কৈলাস থেকে ফিরছি, এমনি চাই।"

লোকটি সামান্য চিন্তা করে; তারপর গাছ থেকে তিনটি আপেল পেড়ে আমাদের হাতে দেয়। বাইরে বেরিয়ে এসে আমি বলি "কি দরকার ছিল লোকের ঘুম ভাঙিয়ে আপেল নেবার?"

ভট্চাযদা উত্তর দেন, "ভোর বেলায় শুধু মুখে পথ হাঁটিতে ভাল লাগে কখনো? "সারাজীবন পাহাড়ে ঘুরছি তুমি আর কতটুকু বোঝ?"

আমি বলি—"সে যাই হোক্, শুনেছিলাম আজকের পথে চড়াই একেবারেই নেই; এখন দেখি চড়াই শেষই হয় না, ব্যাপারটা কি?"

"ওরকম বলতে হয়, না হলে প্রথমে ভয় পেলে রাস্তা হাঁটিবে কি করে?"

প্রায় তিন কিমি ওঠার পর চড়াই শেষ হয়। পাহাড়ে তিন কিমি ওঠা মানে সমতলের ১৫ কিমি হাঁটার চেয়েও বেশী কষ্ট। এরপর উৎরাই পথে দু'ঘণ্টা নামার পর সোসা পেঁছাই। ক্রমে সোসা ছাড়িয়ে পাঙ্গু গ্রামে হাজির হই। পথের ধারে সরকারী ডাক্তার খানা। ডাক্তারবাবু আমাদের দেখে হাসিমুখে চা খাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। তিনজনে ঢুকে পড়ি। চা তৈরীর অবকাশে অতি সুন্দর কাঠের বাড়ীটি ঘুরে দেখি। চা খাওয়ার সময় লক্ষ্য করি বেঞ্চের উপর অতি সুন্দর কার্পেটের আসন বিছানো। ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করি, পাঙ্গু গ্রামে এরকম আসন পাওয়া যায় কিনা? ডাক্তারের সহকারী সুখরাম

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি জানান এই গ্রামে আসন পাওয়া যাবে। চায়ের কাপ ফেলে তখনই সুখরামের সাথে বের হয়ে পড়ি। রাস্তার বিপরীত দিকে সামান্য উঠে একটি বাড়ীতে আসন পেয়ে যাই। অনেক দরাদারির পর ৫০ টাকায় রফা হয়। আসার সময় আসন প্রস্তুতকারী কিশোরীটি অনুরোধ জানায়—ভাইয়া, বাড়ী ফিরে ছবি ও কলকাতার মেঠাই পাঠিয়ে দিও। কথা দিয়ে বিদায় নিয়ে ডাক্তারখানায় এসে দেখি সঙ্গী দু'জন এগিয়ে গেছেন। সুখরাম কিছুটা পথ এগিয়ে দেয় এবং বার বার ছবি পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করে। বাড়ী ফিরে সুখরামের ঠিকানায় ছবি পাঠিয়েছি, জানিনা পেয়েছে কিনা। কিন্তু কলকাতার মেঠাই মানে রসোগাল্লা পাঠান সম্ভব হয়নি।

একলা অনেকটা পথ এসে থানিধরের চায়ের দোকানে সহযাত্রীদের দর্শন মিলল। দোকানের সামনে গাছতলায় বসে খানিক বিশ্রাম করে নিলাম। দলে দলে স্কুল কলেজের ছেলেমেয়ে এবং পুরুষ ও মহিলা ছোট ছেলে-মেয়ে নিয়ে তাওয়াঘাটে থেকে উঠে আসছে। সবাই নিজের গ্রামে চলেছে। উদ্দেশ্য শিরখা গ্রামের উৎসবটিতে যোগ দেওয়া। এ যেন অনেকটা দুর্গাপুজোর সময় বাঙালীদের বাড়ী ফেরার মত। তরুণ-তরুণীদের হাসি ঠাট্টায় চায়ের দোকান সরগরম।

থানিধর থেকে তাওয়াঘাট তিন মাইলে ৬ হাজায় ফুট নামতে হবে। বেশী সময় নষ্ট না করে উৎরাই পথ ধরে নামতে শুরু করি। উৎরাই পথে নামতে খুব বেশী কষ্ট হওয়ার কথা নয় কিন্তু দু'পায়ের বুড়ো আঙুলে ব্যাথা থাকায় নামতে খুবই অসুবিধা। মাথার উপর চড়া রোদ। গত একমাস যাবৎ চড়া রোদের মধ্যে পাহাড়ে হেঁটেও তিব্বতী হাওয়ার দাপটে চেহারার যা অবস্থা হয়েছে তা না বলাই ভাল। একমুখ দাড়ি, ঝাকড়া চুল, মুখ হাত ফেটে কালিবর্ণ, বাড়ীর লোক চিনতে পারলে হয়। হালিশহরে এক আশ্রমে ভট্চাযদার যাতায়াত আছে শুনেছিলাম। ভট্চাযদাকে ডেকে বলি দাদা, চেহারার যা অবস্থা হয়েছে, গিন্নী যদি চিনতে না পারে, যদি বাড়ী ঢুকতে না দেয় তবে সোজা আপনাদের আশ্রমে গিয়ে উঠব। দয়া

করে একটা সিট খালি রাখবেন। আমার কথা শুনে প্রচণ্ড শব্দে হেসে ওঠেন ওঁরা।

বেলা দেড়টার সময় তাওয়াঘাটে পেঁছে গেলাম। ১৯ কিমি পথ নামতে ৮ ঘণ্টা সময় লেগেছে। ধৌলি গঙ্গার পুল পার হয়ে রাস্তার উঠে দেখি সামনে বাস দাঁড়িয়ে। বেলা আড়াইটায় ধারচুলার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু। ২৫০ কিমি পাহাড়ে হাঁটার পর বাসে চেপে যাওয়ার সময় মনে হচ্ছিল জীবনে এই প্রথম বাসে চাপলাম। সাড়ে তিনটা নাগাদ ধারচুলা পেঁছে অনেকেই কালী নদীর অপর তীরে নেপালী বাজারে ছুটলেন জিনিসপত্র কেনার জন্য। সন্ধ্যাবেলা ধারচুলা বাজারটি ঘুরে দেখলাম। ধারচুলা এই অঞ্চলের মধ্যে বড় ব্যবসায়িক কেন্দ্র, সমস্ত জিনিসই পাওয়া যায়। সামান্য দু-চার ঘণ্টায় একটি শহরে আর কতটুকু পরিচয় ঘটে? জানিনা আর কোনদিন এখানে আসা হবে কিনা?

পরের দিন সকাল সাড়ে আটটায় ধারচুলা থেকে যাত্রা শুরু। বাস ছাড়ার আগে মালবাহক রতিরাম ও আরও অনেকে যাত্রীদের কাছে বিদায় নিয়ে গেল।

বিকেল পাঁচটায় বাগেশ্বর শহরে ঢুকতেই দেওয়ালে হিন্দীতে একটি পোষ্টার চোখে পড়ল। "দুর্গাপুজো সমারোহ" নীচে প্রতিমা দর্শনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। আজ মহাঅষ্টমী। তখনই ভট্চাযদার সাথে কথা বলে ঠিক হল যে রাত্রে প্রতিমা দেখতে যাওয়া হবে।

বাংলাদেশে দুর্গাপুজো দেখে আসছি। কিন্তু বাগেশ্বর একটি মাত্র দুর্গাপুজো হয়, সেই পুজো দেখে দুর্গাপুজো কেমন হওয়া উচিত তা হয়ত কিছুটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। সন্ধ্যেবেলা ভট্চাযদা, ঢালিদা, অর্চনাদিও আমি চারজনে বেরিয়ে পড়লাম। রেষ্ট-হাউস থেকে কিছুটা গিয়ে লোহার পুলে একটি নদী পার হতে হল। আগেই বলেছি গোমতী ও সরযূ নদীর সঙ্গমের কাছে প্রাচীন বাগেশ্বর মহাদেবের মন্দির। মন্দির ডাইনে রেখে বাঁদিকে বাজারের

মধ্যে প্রবেশ করলাম। দু'পাশে চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে দোকান। পরিষ্কার পাথরের রাস্তার কোথাও এতটুকু নোংরা নেই দেখে খুব ভাল লাগে। বাজার পার হয়ে একটু উঠে আবার একটি নদী। নদী পার হয়ে, নদীর তীরে রাস্তা, দু-পাশে দোকান। সামান্য গিয়ে বাঁদিকে একটি বড় মাঠ, ডানদিকে লোহার রেলিংয়ের নীচে কুলকুল করে নদী বয়ে চলেছে। নদীর ওপর তীরের রাস্তার বৈদ্যুতিক আলোর ছটা নদীর জলে পড়ে এক অপূর্ব মোহময় পরিবেশ গড়ে তুলেছে। মাঠের প্রথমেই অনেকটা ঘেরা জায়গায় দুর্গাপূজার মণ্ডপ। চারিদিকে আলোর বন্যা। দরজা দিয়ে মণ্ডপে প্রবেশ করে বাঁদিকে বড় সাইজের আলাদা আলাদা প্রতিমা। অষ্টমী পূজা হয়ে গেছে, সামনে স্তূপীকৃত প্রসাদ। প্রতিমার সামনে বসে কয়েকজন স্থানীয় মহিলা ভজন গাইছেন। এত বড় একটা পূজা হচ্ছে কিন্তু মাইকে হিন্দী গান নেই, অশালীন চিৎকার চেঁচামেচি নেই, হুল্লোড় নেই, সমস্ত মণ্ডপ জুড়ে এক অপূর্ব শান্তি বিরাজ করছে। কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি, আলমোড়ার কাছে কোন এক জায়গা থেকে এক পূর্ববঙ্গীয় ভদ্রলোক প্রতি বছর মূর্ত্তি গড়তে আসেন। প্রসাদ হিসেবে যে পরিমাণ লুচি ও হালুয়া আমাদের দেওয়া হল তা চারজনে খেয়ে শেষ করা সম্ভব নয়। এক সময় মাকে প্রণাম করে অন্য দরজা দিয়ে মণ্ডপ থেকে বের হই। বাইরে বেরোতেই দুজন যুবক চারখানি লুচি ও ছোলার তরকারী হাতে গুঁজে দেয়। তাদের জানাই ভিতরে যা প্রসাদ নেওয়া হয়েছে তাই খেয়ে শেষ করতে পারিনি। কিন্তু যুবক দুটি নাছোড় বান্দা, তাই আবার সামান্য কিছু নিতে হয়। একটা কথা শুনে অবাক লাগে যে এতবড় পূজার আয়োজন করা হয়েছে, এর মধ্যে কিন্তু একজনও বাঙালী নেই। কর্মকর্তারা সবাই অবাঙালী। বাঙালী থাকলে বোধহয় পূজার ধরণটি অন্য রকম হ'ত। মাঠের অপর প্রান্তে রামলীলা অনুষ্ঠানের জন্য মঞ্চ করা হয়েছে, সেখানেও আলোর বন্যা। মাঠের মাঝখানে বাদাম ভাজা, ফুচ্‌কা, ঝালমুড়ি নানারকম খেলনা ইত্যাদি নিয়ে একটি ছোট মেলা

বসে গেছে কিন্তু কোথাও এতটুকু চেঁচামেচি নেই। জানতে পারি রাসলীলা অনুষ্ঠান রাত্রি ১১টায় শুরু হবে। অতরাত্রে অনুষ্ঠান দেখা সম্ভব নয় তাই সকলে রেষ্ট হাউসে ফিরে আসি।

বাগেশ্বর রেষ্ট হাউসে স্নান করার জন্য আধুনিক ব্যবস্থা আছে। ভেবেছিলাম ভোরে উঠে স্নান সেরে বাসে চাপব। কিন্তু ভোর তিনটায় উঠে খুব শীত বোধ হওয়ায় স্নান করা সম্ভব হল না। দলনেতা এত তাড়া লাগালেন যে যাত্রীদের ব্রেকফাষ্ট না করেই বাসে উঠতে হল। ভোর চারটার সময় বাস ছাড়ল। কৈলাস যাত্রার শেষ দিন। সাড়ে পাঁচটায় কৌশানী ট্যুরিষ্ট রেষ্ট-হাউসে পেঁাছে ব্রেকফাষ্ট সারা হল। কৌসানী রেষ্ট হাউসটি খুব সুন্দর এবং অবস্থানটিও ভাল। অনেকের ইচ্ছা ছিল কৌসানী থেকে সূর্যোদয় দেখার কিন্তু চারিদিকে কুয়াশা থাকায় সে ইচ্ছা পূর্ণ হল না।

বহু পথ পার হয়ে সাড়ে বারটায় কাঠ-গুদামে পেঁাছে গেলাম। কোন কারণে কাঠগুদামে মধ্যাহ্ন ভোজ হয় না, বাস হলদোয়ানির দিকে এগিয়ে চলে। হলদোয়ানিতে বাস ঢোকা মাত্র দম বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড় হয়। চারিদিকে ধুলো-ধোঁয়া, লোকজন গিজগিজ করছে। গত এক মাস যাবৎ মুক্ত আকাশের নীচে, মুক্ত বাতাসের মধ্যে কাটিয়ে ধুলো-ধোঁয়ার ভিড়ের পরিবেশকে অসহ্য মনে হল। এক সময় মনে হল কেন ফিরে এলাম? কিন্তু উপায় নেই ফিরে আসতেই হল।

হলদোয়ানিতে মধ্যাহ্ন ভোজ শেষ হতে দুটো বেজে যায়। গত এক মাস পাহাড়ী জল হাওয়ায় থেকে ক্ষিদে এত বেড়ে গেছে যে নিজেরই অবাক লাগে। দলনেতা মানিন্দার সিং এখান থেকে বিদায় নিয়ে বেরিলি যাত্রা করলেন। যাওয়ার সময় বুকে জড়িয়ে ধরে বলি, "আবার কবে দেখা হবে?" মানিন্দার ধরা গলায় জবাব দেয়, "চিন্তা করিস না। পৃথিবীটা গোল,—দেখবি আবার কোথাও দেখা হয়ে যাবে।"

মানিন্দার পাঞ্জাবের লোক, আমি বাংলার। কৈলাস যাত্রার আগে কেউ কাউকে চিনতাম না। কিন্তু আজ সে আমার অনেক কাছের

মানুষ। মানিন্দার আমার কৈলাস যাত্রার ব্যাপারে অনেক ভাবে সাহায্য করেছিল। তার ঋণ শোধ হবার নয়।

বাস হলদোয়ানি ছাড়িয়ে ছুটে চলে। ভিতর থেকে একটা চাপা কান্না উঠে গলার কাছে আটকে যায়। বাসের ভিতর আমার চারিপাশে যে সব যাত্রীরা বসে রয়েছেন, আজ রাতে দিল্লী পৌঁছবার পর আর কারও সাথে দেখা হবে না। গত একমাস সকলে এক সাথে কাটিয়েছি, সুখে দুখে পথ হেঁটেছি, আজ ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে—এই কথা ভেবে মন বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। শুধু কি সহযাত্রীরা? রতিরাম, কুলুরাম, গাইড পাণ্ডে, চীনা গাইড ওয়াংচু, বিভিন্ন ক্যাম্পের কেয়ারটেকার, ইয়াকম্যান প্রেমা, নরবু, মানসের তীরে পাশের ঘরের তিব্বতী মেয়েটি, সকলের মুখগুলি থেকে থেকে মনের পর্দায় ভেসে উঠছে। ওদের কাউকে কি কোনদিন ভোলা সম্ভব হবে? ভুলে থাকবার জন্য বাসের জানলা দিয়ে মনটাকে বহু দূরে প্রসারিত করতে চাই কিন্তু দু-পাশে ঘন গাছের জঙ্গলে বাঁধা পেয়ে ভাবনাটা আমার নিজের কাছেই ফিরে আসে।

প্রায় রাত ১১টায় দিল্লীর জনপথে চন্দ্রলোক বিল্ডিংয়ের সামনে বাস দাঁড়ায়? গত ১লা সেপ্টেম্বর এখান থেকেই যাত্রা শুরু হয়েছিল। আজ ১লা অক্টোবর এখানেই যাত্রা শেষ হল। যাত্রীরা প্রত্যেকেই নিজের বাড়ী বা আশ্রয় স্থানের উদ্দেশ্যে চলে গেলেন। আমার কিছু নির্দিষ্ট আশ্রয় না থাকায় সামান্য দূরে একটি স্কুল বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। স্কুলের দারোয়ান মোহন সিং বার বার নিষেধ করা সত্ত্বেও রাত সাড়ে বারোটায় গরম ভাত ডাল রান্না করে খাওয়াল। স্কুল বাড়ীতে রাতটি কাটিয়ে পরদিন সকালে কালী বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। সেদিন দিল্লীতে দশেরা উৎসব, আমাদের বিজয়া দশমীও বটে। দিল্লীর দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রা ও দশেরা উৎসব কিছুটা প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য হল।

তিন দিন কালী বাড়ীতে বিশ্রাম নিয়ে ৫ই অক্টোবর সকাল ৭ টা ১৫ মিনিটে নিউ দিল্লী স্টেশন থেকে স্বগৃহের উদ্দেশ্যে নীলাচল এক্সপ্রেসে উঠে বসলাম।

ওঁ নমঃ শিবায়ঃ

পরিশিষ্ট

মূল কাহিনীতে কিছু কথা বলা হয়ে ওঠেনি তাই এই অধ্যায়ের অবতারণা। হিমালয়ে যতকিছু বৈচিত্র, বৈশিষ্ট ও সৌন্দর্য থাকা সম্ভব, আলমোড়া—ধারচুলা—গার্বিয়াং হয়ে কৈলাস যাত্রা পথে তার সবগুলিই বর্তমান। সেদিক দিয়েও যাত্রাটি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কৈলাস যাত্রার ব্যাপারে ভারত সরকার ও কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগম যাত্রীদের সুখ-সুবিধার্থে যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। বার-তের হাজার ফুট উঁচুতে যেখানে খাবার জলটি যোগাড় করা মুস্কিল, সেখানেও আনুসঙ্গিক সুবিধা ও খাবার-দাবারের যা ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা বাড়ীতে বসেও অনেক সময় সম্ভব নয়। অপরদিকে চীন সীমানায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করেও আশানুরূপ সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়নি। পুলান গেষ্ট হাউসে যে ঘরের দৈনিক ভাড়া তিনশো টাকার উপর, বাগেশ্বর টুরিষ্ট রেষ্ট হাউসে সে তুলনায় চারগুণ সুবিধা সম্পন্ন ঘর মাত্র তিরিশ টাকায় ভাড়া পাওয়া যায়। চীন সীমানায় কৈলাস পরিক্রমাকালে অক্সিজেন পূর্ণ একটি বালিস ছাড়া আর কোনরূপ চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়নি। তাকলাকোটে একটি হাসপাতাল আছে ঠিকই তবে সেটি ডাক্তার ও রোগীশূন্য।

কৈলাস যাত্রাকালে যে সুন্দর আবহাওয়া পেয়েছিলাম তা সত্যই ভাগ্যের ব্যাপার। আসা-যাওয়ার পথে মাত্র আধ ঘণ্টার জন্য বৃষ্টি পেয়েছিলাম। ভবিষ্যৎ যাত্রীদের সমস্ত পথটি, নিচের দিকে বৃষ্টি ও উপরের দিকে বরফপাতের মধ্যে হাঁটতে হতে পারে, সেই ভেবে প্রস্তুত হয়ে যাওয়াই ভাল। যারা কৈলাস যেতে ইচ্ছুক—তাদের জন্য দু-চারটি অতি প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে চাই :—(১) যাত্রার আগের দিন হাত-পায়ের নখ ভাল ভাবে কাটবেন। (২) পোকা ধরা দাঁত থাকলে আগেই তা তুলে নেবেন। (৩) "হান্টার সু" জুতোই ভাল

কাজ দেয়। টেলিগ্রাম পাবার দিন থেকেই ঐ জুতো পরে সকালে ২।৪ মাইল হাঁটা অভ্যাস করুন। তাহলে পায়ে ফোস্কা হয়ে পাহাড়ী পথে দুর্ভোগ পোয়াতে হবে না। জুতো পরার আগে পায়ে অবশ্যই পাউডার লাগাবেন। (৪) শ্বাসকষ্ট নিবারণের জন্য হোমিওপ্যাথি ওষুধ অবশ্যই সঙ্গে রাখবেন। (৫) কঠিন চড়াই ও বরফে হাঁটার সময় চুষে খাবার ভিটামিন 'সি' ট্যাবলেট মুখে রাখবেন। কমপ্লান জাতীয় পানীয় সঙ্গে নিয়ে যাবেন এবং বিশেষ করে তিব্বতে ব্যবহার করবেন। (৬) নাকে লাগাবার ছোট ড্রপ অবশ্যই সঙ্গে রাখবেন। কারণ তিব্বতে পেঁছে অনেকেরই নাক দিয়ে রক্ত পড়তে শুরু করে এবং নীচে না নামা পর্যন্ত তা বন্ধ হয় না। (৭) পাহাড়ী এলাকায় রাতে শোবার সময় গলায়, কোমরে, ঘাড়ে ও হাতে 'বোরো-ক্যাল্ডেুলা' মেখে শোবেন। তা না হলে 'পিশু' নামক একপ্রকার ক্ষুদ্র পাহাড়ী পোঁকা কামড়ে শরীরে ঘা করে দেবে।

অবাঙালী যাত্রীদের মধ্যে পরস্পর কে কাকে কতটা সাহায্য সহযোগিতা করতে পারে তার একটা প্রতিযোগিতা গড়ে উঠেছিল। বাঙালী যাত্রীদের মধ্যে তার সামান্য অংশ দেখা গেলে যাত্রাটি আরও সুখকর হয়ে উঠতে পারতো। কিন্তু তার উল্টোটাই লক্ষ্য করা গেছে।

অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন—এত খরচা করে, এত কষ্ট করে মানস সরোবরে গিয়ে লাভ কি হোল? কৈলাস পরিক্রমা করে ফিরে এক যাত্রীকে অপর এক যাত্রীর দু-বার টাকার জিনিস আত্মসাৎ করার জন্য চরম অশালীন ব্যবহার করতে দেখেছি। অপর এক যাত্রীকে তাঁরই উপকারী ও হিতৈষীকে সন্দেহ ও চরম অবিশ্বাস করতে দেখেছি। কেউ একটা ট্যাবলেটের জন্য কাতর, অন্যজন প্রচুর ট্যাবলেট বাক্সবন্দী করতে তৎপর। অন্যদিকে একজন যাত্রী অন্য যাত্রীকে কতটা উপকার, সেবা ও সাহায্য করতে পারেন—তা দেখারও সুযোগ হয়েছিল। এই সব দেখেশুনে আমার মনে হয়েছে মানস সরোবরে গিয়ে সকলে সমান লাভবান হতে পারেন না। এই প্রসঙ্গে

শ্রদ্ধেয় প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর কথা মনে পড়ছে। তিনি এক জায়গায় মানস সরোবরের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছিলেন—"আলুলায়িত কেশদামের যেমন একটা সৌন্দর্য আছে, মুণ্ডিত মস্তকেরও একটা আলাদা সৌন্দর্য আছে। মানস সরোবরের সৌন্দর্য হচ্ছে, মুণ্ডিত মস্তকের মতো। তিনি আরও লিখেছিলেন—"সাংসারিক আকর্ষণের প্রতি মোহ যাদের কাটেনি, তাদের মানস সরোবরে আসার দরকার নেই।"

কথাগুলি খুবই সত্যি। সাংসারিক মোহ যাদের কাটেনি তারা কৈলাস থেকে ঘুরে এসেও অপরের দু-চার টাকা আত্মসাৎ করার জন্য মারামারি করবেই। অন্যদিকে মুণ্ডিত মস্তকের সৌন্দর্যও তাদের ভাল না লাগাই স্বাভাবিক। কাজেই তাদের কৈলাস মানস না যাওয়াই ভাল।

কৈলাস থেকে ফিরে এসে আমার নিজের সাংসারিক দুঃখ-কষ্ট ও অশান্তি সব দূর হয়ে গেছে একথা বলতে পারিনা। সেগুলি এখনও বর্তমান; তবে সেগুলি আর পূর্বের মতো মনের শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে না। এখন দুঃখ-বেদনা ধারে কাছে এলেই চোখের পলকে মনে মনে কৈলাসে অথবা মানস সরোবরে চলে যাই। দুঃখ-বেদনা মনের ধারে কাছে আসতে পারে না, ফলে মানসিক শান্তি বজায় থাকে। আমার কাছে এটাই সবচেয়ে বড় লাভ।

সব শেষে হয়ত এই কথা বলা যেতে পারে—যে সব মানুষগুলো সাংসারিক বিবিধ আকর্ষণে ও বর্তমান সভ্যতার উপকরণে নিজেকে কিছুতেই তৃপ্ত করতে পারছেন না; অকৃত্রিম মানসিক শান্তির সন্ধানে ছুটে বেড়ানো সেই সব মানুষগুলো তা তারা যেখানেই থাকুক—আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায়, জার্মানীর মিউনিখে, অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণে, ভারতের কোন বড় শহরে অথবা পশ্চিমবাংলার কোন গ্রামেই থাকুক,—একদিন না একদিন কৈলাস-মানস সরোবর তাদের আকর্ষণ করবেই।